Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইসলামিক প্যারেন্টিং

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: মুজিবুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

জাহেদা ইসলাম

রোলঃ 228022196

২০ মে, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইসলামিক প্যারেন্টিং

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: মুজিবুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

জাহেদা ইসলাম

রোলঃ 228022196

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " ইসলামিক প্যারেন্টিং " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে জাহেদা ইসলাম, আইডিঃ 228022196 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: মুজিবুর রহমান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: আরমান হোসাইন
কুরআন ট্রান্সলেশন ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " ইসলামিক প্যারেন্টিং " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতি: মুজিবুর রহমান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

(স্বাক্ষর)

জাহেদা ইসলাম

আইডিঃ 228022196

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

২০ মে, ২০২৫ ইং

সূচিপত্র

ইসলামিক প্যারেন্টিং কি ও কেন? 5

সন্তান জন্মের পূর্বে ও পরে: 6

-গর্ভবতী মায়ের করণীয়..6

গর্ভকালীন সময়ে মায়ের সুরক্ষায় করণীয়..8

সন্তান ভূমিষ্ট হওয়ার পর বাবা মায়ের করণীয়..9

প্রসবকালীন ভ্রান্তি..12

সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার স্থান ৪০ দিন নাপাক থাকে?..14

৪০ দিন পর্যন্ত বাচ্চার মা অস্পৃশ্য থাকে? 15

সন্তান প্রসবের পর চল্লিশ দিন নামায রোযা না করা..15

ধাত্রীকে মায়ের মতো মাহরাম মনে করা 15

আযান-ইকামতে ছেলে-মেয়ের মধ্যে পার্থক্য করা..16

কানে আযান দেওয়া নিয়ে অবহেলা 17

কন্যা সন্তানের জননীকে অপয়া মনে করা 17

বাচ্চার কপালে টিপ দেওয়া..18

ছেলে শিশুর কান ফোঁড়ানো..18

জন্ম দিবস পালন করা..19

নব জাতকের নাম রাখা নিয়ে ভ্রান্তি 19

নাম পরিবর্তন করলে আবার আকিকা করা 19

সন্তানের ইসলামিক অধিকার:..24

সন্তানের চরিত্র গঠনে মায়ের ভূমিকা:..26

সন্তানকে মুমিন হিসেবে গড়ে তুলতে করণীয় 31

সন্তানকে শাসন:..34

সন্তানের বিয়ে: 46

সন্তানের প্রতি লোকমান (আ) এর নসীহত:...48

ইসলামিক প্যারেন্টিং কি ও কেন?

প্যারেন্টিং শব্দটি ইংরেজী, এর সারমর্ম হচ্ছে সন্তান প্রতিপালনে মা-বাবার ভূমিকা। প্যারেন্টিং শব্দটির অর্থ ব্যাপক। প্যারেন্টিং মানে খুব ছোট বয়সে শুধু শিশুর লালন-পালন নয়। প্যারেন্টিং হচ্ছে একটি প্রক্রিয়া বা পদ্ধতি যার মাধ্যমে সন্তানের দৈহিক, মানসিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, বুদ্ধিবৃত্তিক এবং ধর্মীয় প্রতিটি দিক দিয়ে শিশুকাল থেকে যৌবন পর্যন্ত শিক্ষা দান।

প্যারেন্টিং-এর মূল দায়িত্ব সাধারণত পালন করেন জন্মদাত্রী মা এবং বাবা। কিন্তু তারপরও নিকট আত্মীয়-স্বজন যেমন, বড় ভাই-বোন, খালা-খালু, চাচা-চাচী, মামা-মামী, দাদা-দাদী, নানা-নানীরাও প্যারেন্টিং-এর কাজটি করতে পারেন। ইংল্যান্ডের বিখ্যাত পিডিয়াট্রিশিয়ান এবং সাইকোলজিস্ট ডোনাল্ড উইনিকোট বলেছেন, ভাল প্যারেন্টিং-এর অর্থ হচ্ছে সন্তানের জন্মলগ্ন থেকে শুরু করে তার প্রতিটি মুহূর্তের ডেভেলপমেন্টের অর্থাৎ অগ্রগতির বা উন্নতির প্রতি সজাগ থাকা (সজাগ দৃষ্টি রাখা)।

আমাদের দেশে কোন কোন প্যারেন্ট সন্তানের শুধু মাত্র স্বাস্থ্য ও খাওয়া-দাওয়া নিয়ে চিন্তা করেন। আবার কোন কোন প্যারেন্ট শুধু সন্তানের পড়ালেখা নিয়ে বেশী চিন্তা করেন যেমন, সকালে টিচার, সারাদিন স্কুল, বিকেলে কোচিং, রাতে আরেক টিচার ইত্যাদি। আবার কোন কোন প্যারেন্ট সন্তানের কোন বিষয়েরই খোঁজ-খবর নেন না, কিন্তু পরীক্ষায় রেজাল্ট খারাপ হলেই শুরু করেন মারধর, শাস্তি ইত্যাদি। এর কোনটিই ঠিক নয়।

প্যারেন্টিং হচ্ছে একটি পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থাপনা বা complete package. এই প্যাকেজের আওতায় সন্তানের এই দুনিয়ার ভালো এবং আখিরাতের ভালোর জন্য যা যা প্রয়োজন তা সবই সম্পৃক্ত। একটিকে বাদ দিয়ে অন্যটিকে বেশী গুরুত্ব দেয়া যাবে না।

সন্তান জন্মের পূর্বে ও পরে:

সন্তান জন্মের পূর্বে ও পরে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা আমাদেরকে কয়েকটি গাইডলাইন দিয়েছেন, যা আমরা কুরআন হাদীস থেকে অনুধাবন করতে পারবো এবং সে অনুযায়ী আমল করলে আমাদের সন্তান আমাদের জন্য দুনিয়া ও আখিরাতে কল্যাণকর হবে ইনশাআল্লাহ।

-গর্ভবতী মায়ের করণীয়

ইসলামের দৃষ্টিতে গর্ভবতী মায়ের করণীয় হলো:

- আল্লাহর কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা
- সব কষ্ট সহ্য করা
- ঘুমানোর আগে ওযু করা
- প্রতিদিন কিছু কুরআন তেলাওয়াত করা
- দুআ (প্রার্থনা) করা
- পুষ্টিকর এবং পরিমাণে বেশি খাবার খাওয়া
- গুনাহমুক্ত থাকা
- সব ধরনের চিন্তা-পেরেশানি ঝেড়ে ফেলে প্রফুল্লচিত্তে দিন যাপন করা

গর্ভাবস্থায় দুআ করার ক্ষেত্রে:

- সকাল ও সন্ধ্যায় তিনবার, ঘুমানোর আগে তিনবার, প্রতি নামাজের পর একবার এবং অসুস্থতার সময় একবার করে তিন কুল (সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক এবং সূরা আন-নাস) পড়া
- সকাল সন্ধ্যার অন্যান্য মাস নুন আমল এবং হেফাজতের আমল করা।
- নবাগত সন্তানের জন্য বেশি বেশি দোয়া করা।
- দান সাদাকা করা
- সম্ভব হলে ফরজ ইবাদাতের পাশাপাশি বেশি বেশি নফল ইবাদাত করা।

জীবনে মায়ের বিকল্প নেই। মায়ের পায়ের নিচে দেওয়া হয়েছে জান্নাতের সুসংবাদ। গর্ভাবস্থায় একজন মায়ের যে কষ্ট ও বিপন্ন অবস্থার সম্মুখীন হতে হয় তার পুরস্কার

স্বরূপ প্রদান করা হয়েছে মাতৃত্বের এ মর্যাদা; হিরকখণ্ডের চেয়ে দামি বানানো হয়েছে তাদের। মা সন্তানের জন্য সীমাহীন কষ্ট করেন, তাই তো মহান আল্লাহ তার সঙ্গে সদাচরণ করার কথা খুব জোর দিয়ে বলেছেন।

আল্লাহ বলেন, 'আমি মানুষকে তার মা-বাবা সম্পর্কে জোর নির্দেশ দিয়েছি, কেননা তার মা তাকে কষ্টের পর কষ্ট সয়ে পেটে বহন করেছেন আর তার দুধ ছাড়ানো হয় দুই বছরে; তুমি শোকর আদায় কর আমার এবং তোমার পিতা-মাতার। আমারই কাছে (তোমাদেরকে) ফিরে আসতে হবে।' (সুরা লুকমান, আয়াত : ১৪)

গর্ভে সন্তান আসা নারীর জন্য বোঝা নয়, বরং সম্মান ও সৌভাগ্যের। আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত— তিনি বলেন, নবীজি (সা.)-এর পুত্র ইবরাহিমের দুধমাতা সালামাকে (রা.) নবীজি (সা.) বলেছিলেন, তোমরা নারীরা কি এতে খুশি নও যে, যখন কোনো নারী তার স্বামীর পক্ষ থেকে গর্ভধারিণী হয় আর স্বামী তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকেন, তখন সে আল্লাহর জন্য সর্বদা রোজা পালনকারী ও সারা রাত নফল ইবাদতকারীর মতো সওয়াব পেতে থাকবে? তার যখন প্রসব ব্যথা শুরু হয় তখন তার জন্য নয়ন জুড়ানো কী কী নেয়ামত লুকিয়ে রাখা হয়, তা আসমান-জমিনের কোনো অধিবাসীই জানে না। সে যখন সন্তান প্রসব করে তখন তার দুধের প্রতিটি ফোঁটার বিনিময়ে একটি করে নেকি দেওয়া হয়। এ সন্তান যদি কোনো রাতে তাকে জাগিয়ে রাখে (কান্নাকাটি করে মাকে বিরক্ত করে ঘুমুতে না দেয়) তা হলে সে আল্লাহর জন্য নিখুঁত সত্তরটি গোলাম আজাদ করার সওয়াব পাবে।' (তাবরানি, হাদিস : ৬৯০৮; মাজমাউজ জাওয়ায়েদ : ৪/৩০৫)

গর্ভাবস্থায় কোনো নারী মারা গেলে তার জন্য রাসুল (সা.) শহীদ হওয়ার সুসংবাদ শুনিয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'আল্লাহর রাস্তায় নিহত (শহীদ) হওয়া ছাড়াও আরও সাত ধরনের শহীদ আছে— ১. মহামারিতে মৃত্যুবরণকারী শহীদ। ২. পানিতে মৃত্যুবরণকারী শহীদ। ৩. পক্ষাঘাতে মৃত্যুবরণকারী শহীদ। ৪. পেটের রোগের কারণে (কলেরা, ডায়রিয়া ইত্যাদিতে) মৃত্যুবরণকারী শহীদ। ৫. অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণকারী শহীদ। ৬. কোনো কিছুর নিচে চাপা পড়ে মৃত্যুবরণকারীও শহীদ এবং ৭. যে মহিলা গর্ভাবস্থায় মারা যাবে সেও শহীদ।' (আবু দাউদ : ৩১১১)

গর্ভকালীন সময়ে মায়ের সুরক্ষায় করণীয়

১. প্রোটিন ও ভিটামিনসমৃদ্ধ খাদ্যের যোগানমাতৃত্বের প্রয়োজনে প্রোটিন ও ভিটামিনসমৃদ্ধ খাদ্য প্রদানে যত্নবান হওয়া। এদিকে পরিবারের প্রধান বা স্বামীর দৃষ্টি রাখা অবশ্য কর্তব্য। সন্তান গর্ভে এলে গর্ভবতী মাকে পুষ্টিকর এবং পরিমাণে বেশি খাবার দেওয়া প্রয়োজন। কেননা, তার খাবারে একটি নয়, দুটি প্রাণ বাঁচে। মহান আল্লাহ হালাল রিজিক খাওয়া ও কৃতজ্ঞতা জানাতে এভাবে নির্দেশ দিয়েছেন- 'হে মু'মিনগণ! আহার কর আমি তোমাদেরকে যে হালাল রিজিক দিয়েছি তা থেকে এবং আল্লাহর জন্য শোকর কর, যদি তোমরা তাঁরই ইবাদাত কর।' (সুরা বাকারা : ১৭২)।

২. চিকিৎসার নির্দেশমাতৃত্বকালীন সময়ে নারীর শারীরিক ও মানসিক সুস্থতার জন্য সবার আগে তার স্বামীর সহযোগিতা প্রয়োজন। এজন্য গর্ভধারণকারী নারীর প্রতি সবার দায়িত্ব রয়েছে। প্রয়োজনে তাদের দিতে সুচিকিৎসা। হাদিসের একাধিক বর্ণনায় চিকিৎসা গ্রহণের নির্দেশ এসেছে অর্থ 'তোমরা চিকিৎসা করাও, কারণ আল্লাহ তাআলা যে রোগই দিয়েছেন তার প্রতিষেধকও দিয়েছেন। শুধু একটি রোগ ব্যতিত আর তা হচ্ছে, বার্ধক্য।' (আবু দাউদ)। 'নিশ্চয়ই আল্লাহ রোগ এবং দাওয়া (ওষুধ) দু'টিই দিয়েছেন এবং প্রতিটি রোগেরই ওষুধ রয়েছে। সুতরাং তোমরা চিকিৎসা গ্রহণ কর। তবে হারাম বস্তু দিয়ে চিকিৎসা কর না।' (আবু দাউদ)'প্রত্যেক রোগেরই ওষুধ রয়েছে। যখন কোনো রোগের ওষুধ প্রয়োগ হয়, আল্লাহ তাআলার অনুমতিতে তা ভালো হয়ে যায়।' (মুসলিম)। সুতরাং মাতৃত্বকালীন সময় থেকে শুরু করে সন্তান ভূমিষ্ট ও তাদের দুগ্ধপানকালীন সময়েও নারীদের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে তাদের চিকিৎসার প্রতি যতœবান হওয়া স্বামী, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের একান্ত দায়িত্ব।

৩. স্ত্রীর ভরণ-পোষণের মূল দায়িত্ব স্বামীর। হাদিসে পাকে স্ত্রীর যথাযথ দায়িত্ব পালনের নির্দেশনা এসেছে হাদিসে। আর স্ত্রী যদি সন্তানসম্ভবা হয় তবে স্বামীর প্রতি এ দায়িত্ব পালন দ্বিগুণ হয়ে যায়। হাদিসে এসেছে-হজরত মুয়াবিয়অ কুরাইশি রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন- অর্থ 'আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে এলাম। এরপর তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, আমাদের স্ত্রীদের

(হক) বিষয়ে আপনি কী বলেন? তিনি বললেন, তোমরা (স্বামীরা) যা খাবে, তাদের (নারীদের) তাই খেতে দেবে। তাদের তাই পরাবে যা তোমরা পরবে। আর তাদের প্রহার করবে না এবং তাদের কটূ-কাটব্য করবে না।’ (আবু দাউদ)।

সন্তান ভূমিষ্ট হওয়ার পর বাবা মায়ের করণীয়

সন্তান আল্লাহর অনন্য নেয়ামত। কোনো পরিবারে সন্তান ভূমিষ্ঠ হলে খুশির জোয়ার বয়ে যায়। ইসলামে সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর বেশ কিছু করণীয় রয়েছে। এখানে তা সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো—

১. আল্লাহর প্রশংসা করা

সন্তান ভূমিষ্ঠ হলে আল্লাহর প্রশংসা করা, শুকরিয়া আদায় করা ও সন্তানের জন্য দোয়া করা উচিত। পবিত্র কোরআনে ইবরাহিম (আ.) সম্পর্কে বলা হয়েছে, সন্তান লাভের পর তিনি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বলেছেন, 'সব প্রশংসা আল্লাহর, যিনি বৃদ্ধ বয়সে আমাকে ইসমাইল ও ইসহাককে দান করেছেন। নিশ্চয়ই আমার রব দোয়া শোনেন।' (সুরা ইবরাহিম: ৩৯)

২. প্রিয়জনদের সুসংবাদ দেওয়া

সন্তান ভূমিষ্ঠের সুসংবাদ প্রিয়জনদের জানানো নবীদের সুন্নত। আবার সংবাদ জানার পর মা-বাবাকে মোবারকবাদ দেওয়া এবং খুশি প্রকাশ করাও সওয়াবের কাজ। পবিত্র কোরআনে এরশাদ হয়েছে, 'হে জাকারিয়া, আমি তোমাকে একটি পুত্র সন্তানের সুসংবাদ দিচ্ছি, তার নাম ইয়াহইয়া। আগে কাউকে আমি এই নাম দিইনি।' (সুরা মারইয়াম: ৭)

ইবনুল কাইয়িম (রহ.) বলেন, 'সন্তান জন্মের সংবাদ পেলে তার জন্য কল্যাণ ও বরকতের দোয়া করা কর্তব্য।' (তুহফাতুল মওলুদ)

৩. আজান-একামত দেওয়া

সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরপরই ডান কানে আজান দেওয়া সুন্নত। আবু রাফে (রা.) বর্ণনা করেন, 'ফাতিমার ঘরে হাসান ইবন আলি ভূমিষ্ঠ হলে আমি রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে তার কানে আজান দিতে দেখেছি।' (আবু দাউদ ও তিরমিজি) কিছু কিছু বর্ণনায় বাম কানে একামত দেওয়ার কথাও এসেছে।

৪. তাহনিক করা

ইমাম নববি (রহ.) বলেন, সন্তান ভূমিষ্ঠ হলে খেজুর দিয়ে তাহনিক করা সুন্নত। অর্থাৎ খেজুর চিবিয়ে নবজাতকের মুখের তালুতে আলতোভাবে মালিশ করা এবং তার মুখ খুলে দেওয়া, যাতে তার পেটে এর কিছু অংশ প্রবেশ করে। খেজুর

সম্ভব না হলে অন্য কোনো মিষ্টি দ্রব্য দিয়ে তাহনিক করা যেতে পারে। (শরহে মুহাজ্জাব: ৮ / ৪২৪)

আনাস (রা.) বলেন, 'আব্দুল্লাহ ইবনে আবু তালহা ভূমিষ্ঠ হলে আমি তাকে রাসুলুল্লাহ (সা.) কাছে নিয়ে গেলাম। তিনি বললেন, "তোমার কাছে কি খেজুর আছে?" বললাম, হ্যাঁ। রাসুল (সা.) খেজুর চিবালেন। এরপর তা বের করে বাচ্চার মুখে দিলেন। বাচ্চাটি জিহ্বা দিয়ে চুষে ও ঠোঁটে লেগে থাকা অংশ চেটে খেতে লাগল।' (মুসলিম)

৫. মাথা মোড়ানো ও সদকা করা

ছেলে বা মেয়ে হোক, জন্মের সপ্তম দিন চুল কাটা এবং চুলের ওজন পরিমাণ রুপা সদকা করা সুন্নত। আলী (রা.) থেকে বর্ণিত, 'রাসুল (সা.) হাসানের পক্ষ থেকে একটি বকরি আকিকা দিয়েছেন এবং বলেছেন, হে ফাতেমা, তার মাথা মুণ্ডন করো ও তার চুলের ওজন পরিমাণ রুপা সদকা করো।' (তিরমিজি)

৬. আকিকা করা

নবজাতকের পক্ষ থেকে পশু জবাই করাকে আকিকা বলা হয়। অনেক আলিমের মতে, আকিকা সুন্নতে মুয়াক্কাদা। ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, 'রাসুল (সা.) হাসান ও হুসাইনের পক্ষ থেকে একটি করে বকরি জবাই করেছেন।' আনাস (রা.)-এর বর্ণনায় দুটি বকরির কথাও এসেছে। (আবু দাউদ)

ইমাম মালেক (রহ.) মুআত্তায় বর্ণনা করেন, রাসুল (সা.) বলেছেন, 'যার সন্তান হয়, সে যদি সন্তানের পক্ষ থেকে আকিকা করতে চায়, তবে তা করা উচিত। প্রত্যেক সন্তান তার আকিকার বিনিময়ে বন্ধক হিসেবে রক্ষিত। সপ্তম দিন তার পক্ষ থেকে আকিকা করো, নাম রাখ ও চুল কাটো।' (সুনানে আরবাআ)

ছেলের পক্ষ থেকে দুটি এবং মেয়ের পক্ষ থেকে একটি ছাগল আকিকা করা সুন্নত।

৭. অর্থবাচক নাম রাখা

ভূমিষ্ঠ হওয়ার প্রথম দিন বা সপ্তম দিন নবজাতকের নাম রাখা সুন্নত। রাসুল (সা.) বলেন, 'আজ রাতে আমার একটি সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়েছে। আমার পিতা ইবরাহিমের নামানুসারে তার নামকরণ করেছি ইবরাহিম।' (মুসলিম)

হাদিসের ভাষ্য মতে, নবজাতকের নাম সুন্দর ও অর্থবাচক রাখা সুন্নত। রাসুল (সা.) বলেন, 'কিয়ামতের দিন তোমাদেরকে তোমাদের নিজ নামে ও তোমাদের

বাপ–দাদার নামে ডাকা হবে। অতএব তোমাদের নাম সুন্দর করে নাও।’ (আহমদ ও ইবনে হিব্বান)

৮. খতনা করানো

খতনা করানো সুন্নত। কোনো কোনো হাদিসে জন্মের সপ্তম দিনে খতনা করানোর কথা এসেছে। জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল (সা.) হাসান এবং হুসাইনের সপ্তম দিন আকিকা দিয়েছেন এবং খতনা করিয়েছেন। (তবরানি)

মূলত খতনার বয়স জন্মের এক সপ্তাহ পর থেকে শুরু হয়। তবে সাবালক হওয়ার আগে করে ফেলার ব্যাপারে মত দিয়েছেন অধিকাংশ আলিম।

বর্ষ: ০২, সং২০০৭

প্রসবকালীন ভ্রান্তি

সন্তান প্রসবের সুচনা থেকেই নামায নেই মনে করা হয়; এর কয়েকটি স্তর আছে। যেমন-

(ক) সন্তান প্রসবের পূর্বে যখন সাদা স্রাব বের হয় তখনও নামাযের ওয়াক্ত হয়ে গেলে নামায পড়তে হবে। স্রাব ধারাবাহিক নির্গত হতে থাকলে মাজুরের হুকুম ধর্তব্য হবে। কিন্তু কোনো কোনো মা-বোন এসময় নামায নেই মনে করেন। এটা ঠিক নয়।

(খ) সন্তান পূর্ণ বের হওয়ার পর কিংবা অধিকাংশ বের হওয়ার পর থেকে নির্গত রক্তই কেবল নেফাস। সুতরাং এর পূর্বে কোনো কারণে রক্তক্ষরণ হলেও নামায বন্ধ হবে না এবং মাজুর হিসাবে নামায আদায় করতে হবে। এ ক্ষেত্রেও অনেকে নামায ছেড়ে দেয়।

(গ) সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরের রক্তের সাথে যেহেতু নামায বন্ধ হওয়ার সম্পর্ক, তাই কোনো কারণে যদি সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরও রক্তস্রাব চালু না হয়, তাহলে নামাযের বিরতি হবে না বরং স্রাব বের না হওয়া পর্যন্ত নাামায পড়তে হবে। অপারেশনের মাধ্যমে সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর কোনো প্রসূতির স্রাব চালু না হলে তখনও তাকে নামায পড়তে হবে।

প্রকাশ থাকে যে, উল্লেখিত যে সকল ক্ষেত্রে নামায পড়ার কথা বলা হয়েছে। তার উদ্দেশ্য হল, যেভাবে সমর্থ হবে সেভাবেই নামায পড়বে। যেমন, ইশারা করে হলেও নামায পড়বে। অবশ্য অধিক কষ্টের কারণে যদি ইশারাও সম্ভব না হয় এবং তখনও হুশ বাকী থাকে তাহলে পরবর্তিতে ওই নামায কাযা করে নিতে হবে। -তাবয়ীনুল হাকায়েক ১/৬৭; আলবাহরুর রায়েক ১/২১৮; রদ্দুল মুহতার ১/২৯৯; ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/৩৭

পুরুষের সহযোগিতা নেওয়া

কেউ কেউ সন্তান জন্মগ্রহণের সময় কিংবা ক্ষেত্রে পুরুষ ডাক্তার বা পুরুষ সহযোগী থাকাকে আপত্তিকর মনে করে না। অথচ মহিলা ডাক্তার, মহিলা সহযোগী ও ধাত্রীর

ব্যবস্থা করা সম্ভব হলে এ কাজে পুরুষের সরাসরি সাহায্য নেওয়া সম্পূর্ণ নাজায়েজ। হ্যাঁ স্বামী একা সহযোগিতা করতে পারে। এ ছাড়া অন্য কোনো পুরুষ নয়। এটি শরীয়তবিরোধী হওয়া ছাড়া ও মানবীয় রুচিরও পরিপন্থী। আজকাল আধুনিক হাসপাতালগুলোতে সিজারের জন্য মহিলা ডাক্তারের পাশাপাশি পুরুষ ডাক্তারও থাকে। কখনো বা ডাক্তার মহিলা থাকলে সহযোগী থাকে পুরুষ। তাই ভর্তি করার পূর্বেই পূর্ণ মহিলা সার্ভিস আছে কি না এ ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া জরুরি। -আলবাহরুর রায়েক ৮/১৯২; তাহতাবী আলাদ্দুর ৪/১৮৫; ফাতাওয়া হিন্দিয়া ৫/৩৩; আদ্দুররুল মুখতার ৬/৩৭

বাচ্চার নাভি, সংযুক্ত নাড়ি ও অন্যান্য কর্তিত অংশ নিয়ে বিভ্রান্তি

এসব কর্তিত অংশের এলাকাভেদে একেক ধরনের প্রচলন রয়েছে। কোনো কোনো এলাকায় এমনও প্রচলন রয়েছে যে, ওই সব কর্তিত অংশ একটা নির্ধারিত সময় উনুনের উপর ঝুলিয়ে রাখা হয়। এরপর তা পুকুর বা নদীতে ফেলে দেওয়া হয়। এগুলো সবই ভুল। মানুষের শরীরের কর্তিত সবকিছুই মাটির নিচে পুঁতে দেওয়াই নিয়ম।

উনুনের উপর ঝুলিয়ে রাখা ঠিক নয়। এতে সন্তানের নাভি শুকায় বলে ধারণা করা হয়, কিন্তু বাস্তবতার সাথে এর কোনোই মিল নেই। -আল মুহীতুল বুরহানী ৩/১০৬; শরহুল মুহাযযাব ৫/২১৩; ফাতহুল কাদীর ২/৭৬

সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার স্থান ৪০ দিন নাপাক থাকে?

অনেকের ধারণা, যে ঘর বা স্থানে সন্তান ভূমিষ্ঠ হয় সেটা ৪০ দিন পর্যন্ত নাপাক থাকে। এসময় সেখানে নামায, কুরআন তিলাওয়াত কিছুই জায়েয নয়। এধারণা সম্পূর্ণ ভুল। ঘরের কোনো স্থানে নাপাকি লাগলে পূর্ণ ঘরই নাপাক হয়ে যায় না। এমনিভাবে যেখানে নাপাকি লেগেছে নিয়ম অনুযায়ী ধুয়ে মুছে নিলে ওই স্থানও পবিত্র হয়ে যায়। পবিত্র করার পর সেখানে নামায আদায় করা, কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করা সবই জায়েয।

৪০ দিন পর্যন্ত বাচ্চার মা অস্পৃশ্য থাকে?

কোথাও কোথাও এ প্রচলন রয়েছে যে, চল্লিশ দিন পর্যন্ত বাচ্চার মাকে রান্না-বান্না বা অন্য কোনো কাজেরই যোগ্য মনে করা হয় না। তার স্পর্শ লাগলেই সবকিছু নাপাক হয়ে যাবে ধারণা করা হয়; এটিও ভুল। জাহেলী যুগের ধারণা। চল্লিশ দিন পর্যন্ত বাচ্চার মার স্রাব চালু থাকলেও তার ব্যবহৃত থালাবাসন, পেয়ালা কিংবা তার হাতের স্পর্শ লাগা কোনো কিছুই নাপাক হয় না। স্বাভাবিক অবস্থার মতোই তার হাতের রান্না-বান্না খাওয়া বৈধ। তার ব্যবহৃত বাসনকোসন অন্যরাও ব্যবহার করতে পারবে। -আদ্দুররুল মুখতার **১/২৯৯**

সন্তান প্রসবের পর চল্লিশ দিন নামায রোযা না করা

নেফাসের সর্বোচ্চ মেয়াদ চল্লিশ দিন। সবচেয়ে কম সময়ের কোনো নির্দিষ্ট মেয়াদ নেই। এমনকি দু-চার ঘণ্টা বা এক দুই দিনও হতে পারে। কিন্তু কোনো কোনো মহিলা মনে করে যে, স্রাব চালু না থাকলেও সন্তান প্রসবের পর চল্লিশ দিন নামায রোযা করা যায় না। এটি ভুল ধারণা। এ সময় স্রাবে অনিয়ম দেখা দিলে বিজ্ঞ মুফতী সাহেব থেকে মাসআলা জেনে নিতে হবে। মাসআলা না জেনে নিজ থেকে ব্যবস্থা নেওয়া জায়েয হবে না। -আলবাহরুর রায়েক **১/২১৯**; আদ্দুররুল মুখতার ২/২৯৯; খুলাসাতুল ফাতাওয়া **১/২৩১**

ধাত্রীকে মায়ের মতো মাহরাম মনে করা

ধাত্রীকে মায়ের মতো মনে করার বহুল প্রচলন রয়েছে। ভূমিষ্ঠ সন্তানটি কন্যা হলে পরবর্তীতে এ মেয়ের স্বামী স্ত্রীর ধাত্রীর সাথে পর্দা করে না। আবার কোনো কোনো মেয়ে বড় হয়ে তার ধাত্রীর স্বামীর সাথে পর্দা করে না। অথচ শরীয়তের দৃষ্টিতে ধাত্রী পূর্বের মতোই গায়রে মাহরাম। শিশুটি ছেলে হলে যেমন বড় হওয়ার পর ধাত্রীর সাথে তার দেখা-সাক্ষাত সম্পূর্ণ নাজায়েয, তেমনি শিশুটি মেয়ে হলে বড়

হওয়ার পর ধাত্রীর স্বামীর সাথে তার দেখা-সাক্ষাত এবং বিয়ের পর তার স্বামীর সাথে ধাত্রীর সাক্ষাতও হারাম।

শরীয়তে কেবল নিজের জননী, দুধমা, শাশুড়ি ও পিতার স্ত্রীর সঙ্গে দেখা সাক্ষাত জায়েয। এছাড়া অন্য কোনো মহিলাকে মা ডাকলেও তার সাথে দেখা-সাক্ষাত বৈধ নয়। -সূরা নিসা ৩০

নবজাতক সম্পর্কীয় ভ্রান্তিসমূহ

আযান-ইকামতে ছেলে-মেয়ের মধ্যে পার্থক্য করা

ছেলের বেলায় আযান-ইকামত দেওয়া, মেয়ে হলে না দেওয়া বা ছেলের ডান কানে আযান বাম কানে ইকামত, আর কন্যা সন্তানের বেলায় এর উল্টো করা অথবা ছেলে হলে বাড়ির বাইরে গিয়ে উচ্চ স্বরে আযান দেওয়া আর মেয়ে হলে আযান-ইকামত কিছুই না দেওয়া। এসব কিছুই ভুল। নবজাতক ছেলে হোক বা মেয়ে, কানে আযান-ইকামত দেওয়ার বিধানে কোনো ভিন্নতা নেই। কিবলামুখী হয়ে উভয়েরই ডান কানে আযান, বাম কানে ইকামত দেওয়া সুন্নত। মেয়ের ক্ষেত্রে না দেওয়া কিংবা ছেলের বেলায় বাড়ির বাইরে উচ্চ স্বরে দেওয়া শরয়ী নিয়ম নয়; বরং উভয়ের বেলায় আযান-ইকামত হালকা আওয়াজে দিবে। -ইলাউস সুনান ১৭/১২৩; আমালুল ইয়াওমি ওয়াললাইল ৫১৮; আউনুল মাবুদ ১৪/৭; মারাকিল ফালাহ ১০৭

আযান দেওয়ার জন্য পুরুষ কিংবা হুজুর জরুরি মনে করা

নবজাতকের কানে আযান দেওয়ার জন্য আলেম হওয়া জরুরি নয়। যে কোনো মুসলমান ব্যক্তিই আযান জানা থাকলে আযান দিতে পারে। এমনকি মহিলারাও এ আযান দিতে পারে। তবে অন্য পুরুষের শ্রুতিগোচর না হয় এমন আওয়াজে দিতে হবে। উল্লেখ্য, পুরুষ উপস্থিত থাকলে পুরুষেরই আযান দেওয়া উত্তম। -হাশিয়াতুশ শিরওয়ানী আলা তুহফাতিল মুহতাজ ২/৮১

কানে আযান দেওয়া নিয়ে অবহেলা

আজকাল শহুরে পরিবেশে অধিকাংশ বাচ্চার জন্ম ক্লিনিক ও হাসপাতালে হয়ে থাকে। কিন্তু খুব কম সন্তানের কানেই আযান দিতে দেখা যায়। এ ব্যাপারে অত্যন্ত উদাসীনতা ও অবহেলা লক্ষ করা যায়। অথচ এটি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে একাধিক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। সাহাবা তাবেয়ীনদের মধ্যেও এ সুন্নতের উপর আমল হত। মুহাদ্দিসগণ এর বিভিন্ন উপকারিতা বর্ণনা করেছেন। যেমন ভেজালের দুনিয়াতে পদার্পণ করার পরই সর্বপ্রথম আল্লাহ তাআলার বড়ত্বের ধ্বনি বাচ্চার মন-মস্তিস্কে গ্রথিত করা, শয়তানকে আযানের ধ্বনি দিয়ে নবজাতক থেকে বিতাড়িত করা ইত্যাদি। এ ছাড়া এর আরও উপকারিতা রয়েছে। তাই সুন্নতের উপর আমলের নিয়তে করলে এর সকল কল্যাণ হাসিল হবে ইনশাল্লাহ।

কন্যা সন্তানের জননীকে অপয়া মনে করা

যে মহিলার প্রথম কন্যা সন্তান হয় কিংবা একাধিক কন্যা সন্তান হয়, তাকে হতভাগা মনে করা হয়। এটা জাহেলী যুগের ধারণা। ইসলামের সাথে এর কোনো সর্ম্পক নেই। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন

وَ اِذَا بُشِّرَ اَحَدُهُمْ بِالْاُنْثٰى ظَلَّ وَجْهُهٗ مُسْوَدًّا وَّ هُوَ كَظِيْمٌۚ يَتَوَارٰى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوْٓءِ مَا بُشِّرَ بِهٖ ؕ اَيُمْسِكُهٗ عَلٰى هُوْنٍ اَمْ يَدُسُّهٗ فِى التُّرَابِ ؕ اَلَا سَآءَ مَا يَحْكُمُوْنَ.

যখন তাদের কাউকে কন্যা সন্তানের সুসংবাদ দেওয়া হয়, তখন তার মুখ কালো হয়ে যায় এবং অসহ্য মনস্তাপে ক্লিষ্ট হতে থাকে। তাকে শোনানো সুসংবাদের দুঃখে সে লোকদের থেকে মুখ লুকিয়ে থাকে। সে ভাবে, অপমান সহ্য করে তাকে থাকতে দেবে, না তাকে মাটির নিচে পুঁতে ফেলবে। শুনে রাখ, তাদের এই অবস্থা নিতান্তই মন্দ। -সূরা নাহল ৫৮-৫৯

এ ছাড়া হাদীস শরীফে একাধিক কন্যা সন্তানের পিতা-মাতার জন্য জান্নাতের সুসংবাদ রয়েছে। -সহীহ বুখারী হাদীস ১৪১৮; সহীহ মুসলিম হাদীস ২৬৩১, ২৬২৯; তুহফা ৩৩-৩৫

বাচ্চার কপালে টিপ দেওয়া

অনেকে বদনযর থেকে হেফাযতের উদ্দেশ্যে শিশুর কপালে টিপ দিয়ে থাকে। এটি বদনযরকে রোধ করে না শিশুকে নানাবিধ অনিষ্ট থেকে বাঁচানোর জন্য হাদীসে শেখানো যিকির ও দুআগুলোই কার্যকরী ও যথেষ্ট।

ছেলে শিশুর কান ফোঁড়ানো

যে মহিলার একাধিক সন্তান মারা যায় তার পরবর্তী সন্তানকে মৃত্যুর ছোবল থেকে রক্ষার জন্য কান ফোঁড়ানো হয় এবং তাতে স্বর্ণের ছোট অলঙ্ককারও পরিধান করানো হয়। তাদের ধারণা, কান ফুঁড়িয়ে সন্তানকে ত্রুটিযুক্ত করে দিলে আল্লাহ একে আর নিবেন না। ফলে তার মৃত্যুও হবে না। এ ক্ষেত্রে আরও কিছু রেওয়াজ রয়েছে। যেমন বিভিন্ন মন্দ শব্দে এদের নাম রাখা, যথা বন্যা, পঁচা, আগুন, ধ্বসা, মরা ইত্যাদি। ধারণা করা হয়, এতে নাকি তারা মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পায়।
এই বিশ্বাস শরীয়ত পরিপন্থী কুসংস্কার। প্রত্যেক প্রাণীর মৃত্যুর ক্ষণ নির্ধারিত। এসব পদ্ধতি অবলম্বন কারও মৃত্যুকে বিলম্বিত করতে পারে না। এছাড়া উপরোক্ত ব্যবস্থাগুলো এমনিতেই নাজায়েয ও হারাম। ছেলেদের কান ফোঁড়ানো এবং তাতে অলঙ্কার পরানো নাজায়েয। এতে মহিলাদের সাদৃশ্য হয়। আজকাল এটি বিজাতীয় রীতিরও অন্তর্ভুক্ত। হাদীস শরীফে এধরনের সাদৃশ্য অবলম্বনকারীর প্রতি অভিশম্পাত করা হয়েছে। তাছাড়া ছেলেদের জন্য স্বর্ণ ব্যবহার করা হারাম। শিশু বাচ্চাদেরকে কান ফোঁড়ালে এবং স্বর্ণ পরিধান করালে এর গুনাহ মা-বাবার হবে। সন্তানের নাম রাখার ব্যাপারে শরীয়তের নির্দেশনা হচ্ছে, অন্তত ভাল অর্থবোধক নাম রাখা। খারাপ নাম রাখলে শরীয়তের এই সুস্পষ্ট নির্দেশ অমান্য করা হয়। তদুপরি এর ভিত্তি হল কুসংস্কার। সুতরাং এ প্রচলনটি অবশ্যই বর্জনীয়। -সহীহ বুখারী ২/৮৭৪; সুনানে আবুদাউদ ২/২৫৫৯, ২/৬৭৬; তুহফা ৯৯

জন্ম দিবস পালন করা

যে তারিখে বাচ্চা জন্মগ্রহণ করেছে প্রতি বছর ওই দিনটিতে জন্মদিবস পালন করা বিজাতীয় সংস্কৃতি। শরীয়তে এ ধরনের অনর্থক কাজের কোনো বৈধতা নেই। এতে শরীয়ত বিরোধী অন্য কোনো কিছু না থাকলেও শুধু অনর্থক কাজ হওয়ার কারণে কিংবা বিজাতীয় সংস্কৃতির অনুসরণ হওয়ার কারণেই তা নাজায়েয। -আহসানুল ফাতাওয়া ৮/১৫৪

নব জাতকের নাম রাখা নিয়ে ভ্রান্তি

আকিকা ছাড়া নাম রাখা

সন্তানের নাম রাখার জন্য আকিকা করাকে পূর্বশর্ত মনে করা হয় এবং ভাবা হয় আকিকা না করলে সন্তানের নাম স্থিতিশীল হয় না। এজন্য কেউ কেউ আকিকার পূর্বে বাচ্চাকে "বাবু" বা এরকম অন্য কোনো শব্দ বলে ডাকে। আকিকার পর থেকে আসল নামে ডাকে। অথচ নাম রাখা আকিকার সাথে শর্তযুক্ত নয়। আকিকা না করলেও সন্ত-ানের নাম রাখা জায়েয। সাত দিনের পূর্বেও নাম রাখা স্বয়ং রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আমল দ্বারা প্রমাণিত। -সহীহ বুখারী ২/৮২৯; তুহফা ৯৩-৯৪; ইলাউস সুনান ১৭/১২২

নাম পরিবর্তন করলে আবার আকিকা করা

কোনো কারণে পূর্বের নাম পরিবর্তন করতে হলে আবার আকিকা করাকে জরুরি মনে করা হয়। এটি ভুল। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনেক সাহাবীর নাম পরিবর্তন করেছেন কিন্তু এ জন্য পুনরায় আকিকা করতে বলেননি। তারাও কেউ করেননি। -সহীহ বুখারী ৬১৯২; সহীহ মুসলীম হাদীস ২১৪৯; মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা হাদীস ৫৯৫০; তুহফা হাদীস ১১১-১১২

সন্তানের নাম নির্বাচনে ভ্রান্তি

সন্তানের নাম নির্বাচনে শরীয়তের নিদের্শনা কী তা যেন অধিকাংশ মা-বাবাই জানেন না। আজকাল ছেলে-মেয়েদের নাম শুনে তাই মনে হয়। কেউ তো বিধর্মীদের অনুকরণে নাম রাখে এবং এটাকে স্টাইল মনে করে। আবার কেউ কেউ সন্তানের নাম পটল, লেবু, ঝন্টু, লাল মিঞা, কালু মিঞা ইত্যাদি রাখে।

কেউ প্রিয় সন্তানের নাম বিশ্বের সেরাগায়ক ও মডেলদের সাথে মিল করে রাখে। যেখানে ইহুদি, খৃস্টান, এমনকি হিন্দুদেরকেও নামের বাঁধাধরা নিয়ম নীতি মেনে চলতে দেখা যায়, সেখানে মুসলমানদের এই অবনতি। এগুলো দেখলে যে কেউ মনে করে মুসলমানদের কাছে সন্তানের নামকরণের কোনো নীতি নেই। অথচ বাস্তবতা সম্পূর্ণ উল্টো। একমাত্র ইসলামই সন্তানের নাম রাখার ক্ষেত্রে উত্তম ও চমৎকার নীতিমালা দিয়েছে। এ ব্যাপারে অসংখ্য হাদীস রয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর একটি সুন্নত ছিল খারাপ নাম পরিবর্তন করে ভালো নাম রাখা। এজন্য হাদীস গ্রন্থগুলোতে এ বিষয়টিকে একটি স্বতন্ত্র অধ্যায় হিসাবেও বিন্যস্ত করতে দেখা যায়। নিু হাদীস ও সুন্নতের আলোকে নির্ণিত কিছু নীতি পেশ করা হল।

১. 'আব্দুল্লাহ' 'আব্দুর রহমান' নাম রাখা। কেননা হাদীস শরীফে এসেছে,

'' إِنَّ أَحَبَّ أَسْمَائِكُمْ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ عَبْدُ اللهِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ ''

নিশ্চয় আল্লাহ তাআলার নিকটে সর্বাধিক পছন্দনীয় নাম 'আব্দুল্লাহ' ও 'আব্দুর রহমান'। -সহীহ মুসলিম শরীফ, হাদীস ২১৩২; ফাতাওয়া হিন্দিয়া ৫/৩৬২; আদ্দুররুল মুখতার ৬/৪১৭; তুহফা ৯৯

২. নবী, সাহাবা, তাবেয়ীন ও তাবে তাবেয়ীন এবং পূর্ববর্তী অলি-বুজর্গদের নামে নাম রাখা। সহীহ মুসলিমে এ মর্মে একটি অধ্যায় রাখা হয়েছে, যার শিরোনাম হচ্ছে, ''باب التسمى بأسماء الأنبياء والصالحين'' 'নবী এবং সালেহীনের নামে নাম রাখা প্রসঙ্গ' -সহীহ মুসলিম হাদিস ২১৩৫; তুহফা ১১০; রদ্দুল মুখতার ৬/৪১৭

৩. ভালো অর্থবোধক নাম রাখা। হাদীস শরীফে এসেছে, রসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

إِنَّكُمْ تُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَسْمَائِكُمْ وَأَسْمَاءِ آبَائِكُمْ، فَأَحْسِنُوا أَسْمَاءَكُمْ

‘নিশ্চয় কিয়ামতের দিন তোমাদেরকে তোমাদের নাম ও তোমাদের পিতার নাম ধরে ডাকা হবে। অতএব তোমাদের নাম সুন্দর কর।’ -সুনানে আবুদাউদ হাদীস ৪৯৪৮

এছাড়া ভালো অর্থবোধক নাম রাখা এ কারণেও অত্যাবশ্যকীয় যে, নামের প্রভাব ব্যক্তির মাঝে পড়ে থাকে। এটি হাদীস ও আসারে সাহাবা দ্বারা প্রমাণিত। -তুহফা ১২২-১২৩; রদ্দুল মুহতার ৬/৪১৮

৪. আল্লাহ তাআলার জন্য নির্ধারিত গুণবাচক নামসমূহের মধ্যে কোনোটি না রাখা। যেমন- রব, খালেক, সামাদ, জাব্বার, মুতাকাব্বির ইত্যাদি। তবে এগুলোর পূর্বে ‘আব্দ’ সংযোজন করে আব্দুর রব, আব্দুল খালেক, আব্দুস সামাদ ইত্যাদি নাম রাখা যাবে; বরং হাদীস শরীফে এরূপ ‘আব্দ’ যোগে নাম রাখার প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। আজকাল আব্দ ছাড়া শুধু খালেক, মালেক, রহমান, সামাদ-এভাবে ডাকার প্রচলন রয়েছে। এটি একটি নিন্দিত ও গর্হিত কাজ। এ থেকে বেঁচে থাকা অপরিহার্য। -ফাতাওয়া হিন্দিয়া ৫/৩৬২; তুহফা ১০৮

৫. আব্দে আলী, আব্দুল কাবা, আব্দুন্নবী ইত্যাদি নাম না রাখা। শুধু আল্লাহ তাআলার নামের শুরুতেই ‘আব্দ’ শব্দ সংযোজন করে নাম রাখা যায়। অন্য কোনো শব্দের শুরুতে ‘আব্দ’ যোগ করে কারও নাম রাখা যায় না। -তুহফা ১০০-১০৩

৬. যে সব নাম শুনলে অমুসলিমদের নাম মনে হয় এ ধরনের নাম না রাখা। শাহান শাহ, সায়্যিদুল বাসার বা এজাতীয় অর্থবোধক নাম না রাখা। -তুহফা ১০১

৭. ফেরআউন, কারূন, হামান এবং অভিশপ্ত ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর নাম না রাখা। -তুহফা ১০৪

৮. খারাপ অর্থবোধক নাম না রাখা। -তুহফা ১০৫

৯. নবী, রাসূল, ফেরেশতা-এ ধরনের বিশেষ পারিভাষিক শব্দ দ্বারা নাম না রাখা।

মেয়ের নাম বাবার সাথে এবং ছেলের নাম মায়ের সাথে মিলিয়ে রাখা

অনেকের নাম নির্বাচনের সময় প্রধান শর্ত থাকে মেয়ের নাম বাবার নামের প্রথম অক্ষরের সাথে মিল করে রাখা। আর ছেলের নাম মায়ের নামের প্রথম অক্ষরের সাথে মিল করে রাখা, অথচ এটি নাম নির্বাচনের ক্ষেত্রে নূন্যতম ভ্রুক্ষেপ যোগ্য নয়। নাম নির্বাচনের ক্ষেত্রে ওই সব বিষয়ই লক্ষণীয় যা পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।

আরবী শব্দে বা কুরআন-হাদীসে ব্যবহৃত শব্দে নাম রাখা

অনেকে মনে করে নামটি আরবী হলেই চলে। অর্থ যাই হোক না কেন। আর ওই শব্দ যদি কুরআন-হাদীসের হয়ে থাকে তবে তো আর প্রশ্নই নেই। নাম রাখার জন্য বড় দলিল হয়ে যায়। অথচ শরীয়তে নাম রাখার জন্য যে সকল নীতি দিয়েছে সেখানে স্পষ্ট রয়েছে যে, নামটি ভালো অর্থের হতে হবে। শুধু আরবী বা শুধু কুরআনের শব্দ বলেই তা নাম হিসাবে চয়ন করা যাবে না। অর্থের দিকেও খেয়াল রাখতে হবে। কুরআন মজীদে জাহান্নাম, শয়তান, ফেরআউন ইত্যাদি শব্দও রয়েছে। তাই বলে কি এ সকল শব্দ দ্বারা নাম রাখা যাবে? কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত কোনো কোনো মুসলমান সন্তানের নাম শুধু শব্দটি কুরআনে আছে বলেই রেখে দেওয়া হয়। যেমন 'কাফিরুন' (কাফের এর বহু বচন) 'ঝাফীর' (জাহান্নামীদের আর্ত চিৎকার) 'রিবা' (সুদ) 'নবীউল্লাহ' (আল্লাহর নবী) 'মুরসালীন' (রসূলগণ) 'আম্বিয়া' (নবীগণ) 'মাহীন' (তুচ্ছ) ইত্যাদি নাম রাখতে দেখা যায়। আম্বিয়া সাধারণত মহিলাদের নাম রাখা হয়। এর অর্থ নবীগণ। কী আশ্চর্য? কোনো নবী নারী ছিলেন না। অথচ একজন মহিলার নাম রাখা হচ্ছে নবীগণ! পুরুষ হলেও নবী নয় এমন ব্যক্তির নাম কীভাবে নবী রাখা হয়? আর রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পরে তো কোন নবী হওয়ার অবকাশই নেই। এ ভুলের মূল কারণ শরীয়ত ও আরবীর নূন্যতম জ্ঞান না থাকা।

আনকমন নাম রাখা

আজকাল কেউ নাম চাইলেই বলে, হুজুর নামটা আনকমন হতে হবে। বলার ভঙ্গিতে মনে হয় ৪০-৫০ বছরে কারও নাম হিসাবে শোনেনি এমন নাম চাচ্ছেন। কিন্তু শরীয়তের নীতিমালা অনুসরণে এত বিরল নাম পাওয়া যাবে কীভাবে? শরীয়তের দৃষ্টিতে উত্তম নাম রাখলে তো নবী-রাসূল ও পুণ্যবান লোকদের নামই রাখতে হয়। কিন্তু এগুলো তো আনকমন নয়। বাধ্য হয়ে তখন খারাপ অর্থের আরবী শব্দ কিংবা পটল, ডিজেল ইত্যাদি নাম রাখে, যা আদৌ ঠিক নয়।

মুহাম্মাদ ও মুসাম্মাৎ সংযোজন

ছেলেদের নামের শুরুতে মুহাম্মাদ সংযোজনকে জরুরি মনে করা হয়। এটি জরুরি নয়। আর মেয়েদের নামের শুরুতে মুসাম্মাৎ সংযোজন করা হয়। এর অর্থ নাম্মী। তাহলে মুসাম্মাৎ শরীফা অর্থ দাড়াবে শরীফা নাম্মী। আচ্ছা বলুনতো নাম্মী শব্দটি কি নামের অংশ হতে পারে?

নবজাতকের চুল কাটা নিয়ে ভ্রান্তি

মনে করা হয় জন্ম দিনে আকিকা না করলে চুলও কাটা যাবে না। কিন্তু বাস্তবতা হল আকিকার সাথে চুল কাটার কোনোই সম্পর্ক নেই। দুটি ভিন্ন ভিন্ন হুকুম। সুতরাং কারও আকিকা করার সামর্থ্য না হলে ৭ম দিনে চুল কাটতে বিলম্ব করবে না। লক্ষণীয় যে, হাদীসে দিন-তারিখ নির্ধারিত করে এ হুকুমটি করা হয়েছে। এতদসত্ত্বেও এ সুন্নতের উপর আমল করা হচ্ছে না। পক্ষান্তরে শরীয়ত যে ক্ষেত্রে দিন তারিখ নির্দিষ্ট করেনি সেখানে আমরা নিজ থেকে দিন-তারিখ নির্ধারিত করে থাকি খুব কঠোরভাবে। যেমন ঈসালে সওয়াবের কোনো দিন তারিখ শরীয়তে নির্দিষ্ট নেই। অথচ সমাজের অনেকেই মৃত্যুর ৩য় দিন, ৭ম দিন ও ৪০তম দিনে তা করাকে জরুরি মনে করে। তদ্রূপ যিয়ারতের জন্য দিন তারিখ নির্দিষ্ট নেই। কিন্তু অনেকে ঈদের দিন, শবে-বরাতে কবর যিয়ারত জরুরি মনে করে। এসব কিছুই বাড়াবাড়ি। আল্লাহ তাআলা সকলকে হেফাজত করুন।

অনেকে ৭ম দিনের আগে আকিকা করবে না আগে মাথা কামাবে এ নিয়ে দ্বিধায় ভুগেন। অনেককে বলতে শুনি, আকিকার আগে মাথা কামানো যাবেই না। এটি ঠিক নয়। যে কোনোটি আগে বা পরে করা যেতে পারে। এ দুয়ের মধ্যে ধারাবাহিকতা জরুরি নয়। অবশ্য কোনটি আগে করা উত্তম এনিয়ে ফিকহবিদদের মধ্যে মতানৈক্য থাকলেও অধিকাংশের মত হল আগে আকিকা করা পরে চুল কাটা উত্তম। -ইলাউস সুনান ১৭/১২৬

চুল সমপরিমাণ চাঁদি বা তার মূল্য সদকা না করা

চুল সমপরিমাণ চাঁদি বা তার মূল্য সদকা করা সুন্নত। অনেকে এই সুন্নতটির প্রতি গুরুত্ব দেয় না। অথচ এটি সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। সাহাবা তাবেয়ীনের যুগেও এর উপর আমল ছিল। এটি ভিন্ন একটি সুন্নত। -মুআত্তা মালেক ২/৫০১; তুহফা ৮৯-৯০; আততালখীসুল হাবীর ৪/১৪৮

মাথার কিছু অংশে অল্প চুল রেখে দেওয়া

কোথাও কোথাও এমন প্রচলন দেখা যায় যে, মাথা কামানোর সময় মধ্যখানে কিছু চুল রেখে দেয়। এভাবে কিছু চুল কেটে কিছু রেখে দিতে হাদীস শরীফে নিষেধ করা হয়েছে। -সহীহ বুখারী, হাদীস ৫৯২; সহীহ মুসলিম, হাদীস ২১২; তুহফা ৯১

সন্তানের ইসলামিক অধিকার:

মহান আল্লাহ আদম সন্তানকে বিশেষ সম্মান দিয়েছেন। তাদের অধিকারও সংরক্ষণ করেছেন।

আদম সন্তানের বড়দের যেমন অধিকার আছে, তেমনি শিশুদেরও অধিকার আছে। নিম্নে ইসলামের দৃষ্টিতে শিশুদের কিছু গুরুত্বপূর্ণ অধিকার তুলে ধরা হলো:

বেঁচে থাকার অধিকার: এক সময় কন্যা শিশুদের বেঁচে থাকার অধিকার পর্যন্ত হরণ করা হয়েছিল।

ইসলাম এসে তাদের বেঁচে থাকার অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছে। শিশু হত্যার ভয়াবহ পরিণামের দিকে ইঙ্গিত করে পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে, আর যখন জীবন্ত কবরস্থ কন্যাকে জিজ্ঞাসা করা হবে।

কী অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছে? (সুরা তাকভীর, আয়াত : ৮-৯)

তাফসিরবিদদের মতে, মূলত সেদিন হত্যাকারীদের ভর্ৎসনা করার জন্য এভাবে প্রশ্ন করা হবে, কারণ মূল অপরাধী তো তারা। পরে তাদের কঠিন শাস্তির সম্মুখীন করা হবে।

দুধ পানের ব্যবস্থা করা: জন্মের পর শিশুর অন্যতম অধিকার হলো, তার দুধ পানের ব্যবস্থা করা। তার যত্ন নেওয়া। তাকে সব ধরনের রোগ বালাই থেকে মুক্ত রাখতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া। পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে, 'আর মায়েরা তাদের সন্তানদের পূর্ণ দুই বছর দুধ পান করাবে। ' (সুরা বাকারা, আয়াত : ২৩৩) বিশেষজ্ঞরা এ ব্যাপারে একমত যে শিশুকে বুকের দুধ পান করানো মা এবং শিশু উভয়ের স্বাস্থ্যের জন্য ভালো। যে কোনো ধরণের ইনফেকশন, ডাইরিয়া এবং বমি ভাব বন্ধ করার ক্ষেত্রে মায়ের দুধ ভালো রক্ষাকবচের কাজ করে। পরবর্তী জীবনে স্থূলতাসহ অন্যান্য রোগ প্রতিরোধ করতে সহায়তা করে। আর মায়ের জন্য স্তন এবং ওভারির ক্যান্সারে ঝুঁকি কমায়।

সুন্দর নাম ঠিক করা: নাম প্রতিটি মানুষের জীবন-মরণের সঙ্গী। তাই শিশুর নাম রাখার ক্ষেত্রে অবশ্যই ভালো অর্থবোধক নাম রাখা উচিত। রাসুল (সা.) পিতার

ওপর সন্তানের যে কয়টি অধিকারের কথা উল্লেখ করেছেন, তার মধ্যে অন্যতম হলো, তার সুন্দর নাম রাখা ও আদব শিষ্টাচার শিক্ষা দেওয়া। (শুআবুল ইমান)

শিশুকে ভালোবাসা: হজরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'নবী (সা.) দিনের এক অংশে বের হলেন, তিনি আমার সঙ্গে কথা বলেননি এবং আমিও তাঁর সঙ্গে কথা বলিনি। অবশেষে তিনি বনু কাইনুকা বাজারে এলেন (সেখান থেকে ফিরে এসে) হজরত ফাতেমা (রা.)-এর ঘরের আঙিনায় বসলেন। অতঃপর বললেন, এখানে খোকা [হাসান (রা.)] আছে কি? এখানে খোকা আছে কি? ফাতেমা (রা.) তাঁকে কিছুক্ষণ সময় দিলেন। আমার ধারণা হলো, তিনি তাঁকে পুঁতির মালা, সোনা-রুপা ছাড়া যা বাচ্চাদের পরানো হতো, পরাচ্ছিলেন (সাজিয়ে দিচ্ছিলেন)। তারপর তিনি দৌড়ে এসে তাকে জড়িয়ে ধরলেন এবং চুমু খেলেন। তখন তিনি বললেন, হে আল্লাহ! তুমি তাকে (হাসানকে) মহব্বত করো এবং তাকে যে ভালোবাসবে তাকেও মহব্বত করো। ' (বুখারি, হাদিস : ২১২২)

দ্বিনি ইলম শিক্ষা দেওয়া: দ্বিনী ইলম শিক্ষা করা সকল মুসলমানের ওপর ফরজ। তাই সন্তানকে তার দৈনন্দিন ইবাদতের জন্য যতটুকু ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন করা দরকার, কমপক্ষে ততটুকু ইলম অর্জনের ব্যবস্থা করতেই হবে। তাকে পবিত্রতা শিক্ষা দিতে হবে, কোরআন শিক্ষা দিতে হবে, প্রয়োজনীয় মাসআলা-মাসায়েল শিক্ষা দিতে হবে। শিশুকে ভালোভাবে গড়ে তোলার জন্য তাকে নানা বিচিত্র অভিজ্ঞতার মুখোমুখি করা, তার প্রতিভাকে মূল্যায়ন করা, সাধ্য মতো তাকে সময় দেওয়া যেতে পারে। পাশাপাশি তাকে আস্তে বিভিন্ন গুনাহ সম্পর্কে সতর্ক করাও মা-বাবার দায়িত্ব।

খেলাধুলার সুযোগ দেওয়া: শিশুর শারীরিক স্বাস্থ্যের পাশাপাশি তার মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নতিও প্রয়োজন। এ জন্য দরকার চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থা। খোলা মাঠ, মুক্ত আকাশ ও বিশুদ্ধ বাতাস শিশুর মনকে প্রফুল্ল করে। তাই তাদের মাঝে মধ্যে বেড়াতে নিয়ে যাওয়া উচিত।

ইমাম গাজালি (রহ.) বলেন, শিশু যখন মক্তব (বিদ্যালয়) থেকে ফিরে আসে, তখন তাকে খেলাধুলার সুযোগ দেওয়া উচিত। যাতে দীর্ঘ সময়ের পড়াশোনার চাপ দূর হয়ে যায়। শিশুকে যদি খেলাধুলার সুযোগ না দেওয়া হয় এবং সারাক্ষণ বই-খাতা

নিয়ে বসে থাকতে বাধ্য করা হয়, তাহলে তার স্বতঃস্ফূর্ততা বিনষ্ট হয়ে যাবে এবং স্মৃতিশক্তি দুর্বল হয়ে পড়বে। পড়াশোনা তার কাছে কারাগারের শাস্তি বলে মনে হবে। ফলে সে যে কোনোভাবে এই বন্দিদশা থেকে মুক্তির জন্য অস্থির হয়ে উঠবে। (ইহয়াউ উলুমিদ্দীন : ৩/৫৯)

সন্তানের চরিত্র গঠনে মায়ের ভূমিকা:

পৃথিবীতে সন্তানের সবচেয়ে নিকটতম মানুষ মা। সন্তানের জন্য মায়ের যে মমতা ও ব্যাকুলতা তার কোনো তুলনা নেই। তাই তো জনম দুঃখিনী মা নিজের সকল সুখ-শান্তি বিসর্জন দেন সন্তানের প্রশান্তি চেয়ে। মমতাময়ী মা ভুলে যান তাঁর দুঃখ যাতনা কলিজার টুকরো সন্তানের মুখের দিকে তাকিয়ে। কিন্তু প্রিয় সন্তানের কল্যাণ কামনায় একজন মায়ের করণীয় কী? মা কিভাবে গড়ে তুলবেন তার সন্তানকে? কিভাবে সন্তানকে সচেতন করবেন পিতা-মাতার মর্যাদা ও হক সম্পর্কে? পিতা-মাতা কিভাবে রক্ষা পাবেন সন্তানের অবাধ্যতা ও অসৎ আচরণ হতে? সন্তানের আসল ভবিষ্যত কী? কোন পথে সাধিত হবে তার ভবিষ্যতের কল্যাণ? এ সব প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা করেছি বক্ষ্যমান নিবন্ধে।

সন্তানের লালন-পালন ও উত্তম চরিত্র গঠনে মায়ের ভূমিকা অগ্রগণ্য। মায়ের কোল প্রতিটি সন্তানের প্রথম পাঠশালা। মায়ের কাছেই সন্তান গ্রহণ করে জীবনের প্রথম পাঠ। মায়ের ভাষাতেই ফোটে সন্তানের প্রথম কথা। মায়ের আচরণ থেকেই সে শিখে জীবন যাপনের নিয়ম। শৈশব-কৈশোরে সন্তানের মধ্যে যে স্বভাব-চরিত্র গড়ে উঠে, সেটাই তার জীবনের শেকড় ও ভিত্তি হিসেবে কাজ করে। এরপর যখন সে পরিণত বয়সে উপনীত হয়, তখন কৈশোরে গড়া সেই ভিত্তিই তার জীবন যাপনের ক্ষেত্রে নিয়ামক হিসেবে কাজ করে। তাই সন্তানের উষালগ্ন হতে যদি তাকে সঠিক তরবিয়ত দেয়া না হয়, উত্তম শিক্ষা-দীক্ষা ও আদব-কায়দায় গড়ে তোলা না হয়, তাহলে পরে আর কোনো পন্থাই কার্যকর হয় না।

প্রতিটি মুসলিম পরিবারের জানা থাকা উচিত, আমাদের আসল পরিচয় আমরা মুসলমান। আমাদের মূল ঠিকানা ও আসল গন্তব্য পরকাল। সুতরাং পার্থিব চাহিদা,

ধন-সম্পদ ও প্রাচুর্যের অভিলাষ এবং তথাকথিত আধুনিকতার স্রোতে আমরা যেন আমাদের পরিচয় ভুলে না যাই। তাই প্রত্যেক পিতা-মাতার আবশ্যিক কর্তব্য হবে তাদের সন্তানদের দ্বীন ও ঈমান রক্ষা করা। তাদের অন্তরে আল্লাহ তাআলার পরিচয় গেঁথে দেয়া। তাওহীদ ও রিসালাতের বিশ্বাস তাদের হৃদয়ে বদ্ধমূল করা। কারণ সন্তান হয়ত প্রত্যাশামত দুনিয়ার সব কিছুই পেল। ভোগ-বিলাস ও আরাম-আয়েশের সব উপকরণই অর্জন করল। কিন্তু সে আল্লাহকে পেল না, পরকাল চিনল না, মনে রাখতে হবে সে কিছুই পেল না।

যে পিতামাতা তাদের সন্তানদের আখেরাত ধ্বংস করল, মুসলমান হয়েও সন্তানকে মুসলমান হিসেবে জীবন যাপন করার সুযোগ দিল না সেই মা-বাবা সন্তানের মৌলিক অধিকার রক্ষা করল না, তাদের আসল দায়িত্বই পালন করল না। তারা হলেন জালিম আর সন্তান হল মাজলুম।

জীবনী ও ইতিহাসগ্রন্থে আমাদের আকাবির-আসলাফের এমন হাজারো ঘটনা খুঁজে পাওয়া যায়, যেখানে সন্তানকে জিহাদের ময়দানে এবং হিজরত ও দ্বীনের দাওয়াতে প্রেরণে আর দ্বীনি শিক্ষায় শিক্ষিত করণে শুধু মায়েরাই বিশেষ ভূমিকা রেখেছেন। এখানে সে রকম কয়েকটি ঘটনা পেশ করছি।

উম্মে আনাস ইবনে মালেক রা. হযরত আনাস রা. বলেন, হযরত আবু তালহা রা. উম্মে সুলাইমকে বিবাহের

প্রস্তাব দিলেন। উম্মে সুলাইম বলেন, আমার ছেলে আনাস প্রাপ্তবয়স্ক না হওয়া পর্যন্ত এবং ইলমের মজলিসগুলোতে না বসা পর্যন্ত আমি বিবাহ করবো না। হযরত আনাস রা. বলেন, আল্লাহ তাআলা আমার আম্মাকে উত্তম বিনিময় দান করুন তিনি আমাকে উত্তমভাবে লালন-পালন করেছেন। হযরত আনাস রা. ইলম শেখা আরম্ভ করার পর তিনি আবু তালহা রা.-এর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন।-তবাকাতে ইবনে সা'দ ৮ : ৩১১

অন্য বর্ণনায় রয়েছে, হযরত আনাস রা. যখন দশ বছর বয়সে উপনীত হলেন, তার আম্মা হযরত উম্মে সুলাইম তাকে নিয়ে রাসূলের দরবারে আগমন করলেন এবং বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই আমার ছেলে আনাস। আজ থেকে আপনার খেদমত করবে। তখন থেকেই আনাস রা. নিয়মিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমত করেছেন এবং আল্লাহর রাসূলের খাদেম হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন। প্রাগুক্ত

উম্মে সুফিয়ান সাওরী : হযরত ওয়াকী ইবনুল জাররাহ রাহ. বলেন, সুফিয়ান সাওরীর আম্মা তার পুত্র সুফিয়ানকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন, হে বৎস! তুমি ইলম অর্জন করো। আমি সুতাকাটার বিনিময়ে যে পারিশ্রমিক পাব তা দিয়ে তোমার লালন-পালন ও ব্যয়ভার বহন করার জন্য যথেষ্ট হবো। হে আমার পুত্র ! তুমি দশটি হাদীস লেখার পর দেখ, তোমার মধ্যে জ্ঞানার্জনের চাহিদা, সহিষ্ণুতা, শিষ্টতা ও গাম্ভীর্য বেড়েছে কি না , তোমার মধ্যে যদি এ ক্ষেত্রে কোনো উন্নতি না ঘটে, ইলমের চাহিদা বৃদ্ধি না পায়, তবে মনে রেখ এটা তোমার উপকার-অপকার, লাভ-ক্ষতি কিছুই করবে না।-তারিখে আবুল কাসেম জুরজানী

উম্মে রবীআতুর রাঈ

হযরত আদুল ওয়াহহাব ইবনে আতা রহ. বলেন, রবীআর পিতা আবু আবদুর রহমান-যার আসল নাম ফররুখ-বনু উমাইয়ার শাসনামলে একজন সৈনিক হিসেবে খোরাসানের যুদ্ধে যান। রবীআ তখন তার মায়ের গর্ভে ছিলেন। যাওয়ার সময় উম্মে রবীআর নিকট ত্রিশ হাজার দীনার (স্বর্ণমুদ্রা) রেখে যান। সুদীর্ঘ সাতাশ বছর পর তিনি মদীনায় ফিরে আসেন। পিতা ফররুখ ঘরে প্রবেশ করলেন। এখানে পিতা-পুত্রের অপরিচিতিজনিত একটি সুন্দর ঘটনা আছে। এরপর পুত্র রবীআর দিকে তাকিয়ে বললেন, এ-ই আমার ছেলে? স্ত্রী বললেন, হ্যাঁ। তারপর তিনি স্ত্রীকে বললেন, যাওয়ার সময় তোমার কাছে যে সম্পদ (দীনার) রেখে গিয়েছিলাম সেগুলো বের করে দাও। স্ত্রী বললেন, এগুলো আমি সংরক্ষণ করেছি। এখনই তা জানতে পারবেন।

তারপর পুত্র রবীআ মসজিদে গমন করলেন। যথারীতি তার মজলিসে গিয়ে বসলেন। ইমাম মালেক, হাসান ইবনে যায়দ, ইবনু আবু আলী লাহাবী ও মদীনার অন্যান্য গণ্য-মান্য ব্যক্তি উপস্থিত হলেন। উম্মে রবীআ স্বামীকে বললেন, যান, মসজিদে নববীতে গিয়ে নামায পড়ে আসেন। তিনি মসজিদে এসে নামায পড়লেন। অতঃপর লোকজনে ভরপুর মজলিসের দিকে তার নজর পড়লো। তিনি সেখানে গিয়ে বসলেন। তারা তার জন্য একটু জায়গা প্রশস্ত করে দিলেন। রবীআ এমনভাবে মাথানত করে রাখলেন, যেন তিনি তাকে (পিতা) দেখেননি। তার দেহ চাদর আবৃত ছিলো। পিতা ফররুখ কিছুক্ষণ ভেবে বললেন, আল্লাহ তাআলা সন্তানকে অনেক উচ্চ মর্যাদা দান করেছেন।

তারপর পিতা ঘরে ফিরে গেলেন এবং ছেলের মাকে বললেন, আজ তোমার ছেলেকে এমন অবস্থায় দেখতে পেলাম, যে অবস্থানে কোনো আলেম বা মুফতীকে দেখতে পাইনি। উত্তরে তার আম্মা বললেন, এবার বলুন, আপনার নিকট কোনটি বেশি প্রিয়-ত্রিশ হাজার দীনার, নাকি সন্তানের এই উচ্চ মর্যাদা। তিনি বললেন, আল্লাহর কসম! সন্তানের এই মর্যাদাই আমার কাছে প্রিয়। উম্মে রবীআ বললেন, আপনার রেখে যাওয়া সব দীনার তার জন্যই ব্যয় করেছি। পিতা বললেন,
আল্লাহর কসম! তুমি তা অনর্থক কাজে নষ্ট করনি।

উম্মে মালেক ইবনে আনাস : ইমাম মালেক রহ. তখন কিশোর। সুললিত কণ্ঠের অধিকারী ছিলেন। তাই তার গান শেখার ইচ্ছে হল। মাকে গান শেখার কথা বললেন। তাঁর আম্মা তাকে বললেন যে, তুমি তো গায়কদের মতো সুন্দর নও। গায়ক যদি দেখতে সুন্দর না হয় তাহলে মানুষ তার দিকে ফিরেও তাকায় না। সুতরাং তুমি গানের চিন্তা বাদ দিয়ে ফিকহ অর্জন কর। ইমাম মালেক রহ. বলেন, তখন আমি গায়কদের পরিত্যাগ করে ফুকাহাদের অনুসরণ করলাম। ফলে
আল্লাহ তাআলা আমাকে কোন অবস্থানে পৌঁছিয়েছেন তা তো দেখতেই পাচ্ছেন। অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে, মা তার মাথায় টুপি পরিয়ে দিলেন এবং তার উপর ধবধবে সাদা একটি পাগড়ী বেঁধে দিয়ে বললেন, যাও! এখন তুমি রবীআতুর রাঈ-এর মজলিসে গিয়ে বস। তার নিকট থেকে ইলম শেখার পূর্বে আদব শেখ। ইমাম মালেক তার সান্নিধ্যে থেকে ফিকহ ও হাদীস অর্জন করেন। তিনি বলতেন, রবীআর মৃত্যুর পর থেকে ফিকহের স্বাদ নিঃশেষ হয়ে গেছে।

-তারতীবুল মাদারিক ১/১১৯; তানভীরুল হাওয়ালিক ১৬৪মাস খানেক আগের কথা। একদিন সকালে আমার ছোট ভাই ফোন করে বলল, 'আপু তোমাদের স্কুলের সেই ... সাহেব গতকাল মারা গেছে। আমরা আজ সকালে তার জানাযা পড়েছি।' আমি 'ইন্নালিল্লাহ' বললাম এবং ভাবনার জগতে হারিয়ে গেলাম। আজ থেকে ১২/১৩ বছর আগের কথা। আমি এবং আমার প্রতিবেশী একটি মেয়ে প্রথম বোরকা পরে স্কুলে গিয়েছিলাম। অল্প সময়ের মধ্যে আমাদের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল প্রায় ত্রিশ জনে। সবাই পড়াশোনায় ভালো ছিল। শিক্ষক-শিক্ষিকারা তাদের আদর করতেন। আমাদের শিক্ষকদের অনেকেই বোরকা পছন্দ করতেন। তারা খুশি হলেন। কেউ কেউ অপছন্দ করতেন। তবে তারাও উচ্চবাচ্য করলেন না। আমরা এসএসসির প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম। কিছুদিন পর টেস্ট পরীক্ষা। হঠাৎ একদিন স্কুলের

প্রধান শিক্ষক আমাদের সবাইকে তলব করলেন। আমরা দুরু দুরু বুকে উপস্থিত হলাম। দেখলাম স্কুলের সব শিক্ষক-শিক্ষিকা সেখানে আছেন। প্রধান শিক্ষক বললেন, 'তোমরা বোরকা পরে স্কুলে আসো ভালো কথা। কিন্তু আগামীকাল থেকে স্কুলের ভিতর এসে বোরকা খুলে ফেলবে। এটা উপরের নির্দেশ। আগামীকাল থেকেই তা কার্যকর করতে হবে।' সহপাঠীরা আমাকে ইশারা করল কিছু বলার জন্য। আমি সাহস করে বললাম, 'স্কুলের ভিতরে পুরুষ শিক্ষকরা তো আছেন। বোরকা খুলে ক্লাস করব কিভাবে?' প্রধান শিক্ষক এবার একটি আশ্চর্য কথা বললেন, 'শিক্ষকগণ পিতা-মাতার সমতুল্য। তাই তাঁদের সামনে বোরকা ছাড়া উপস্থিত হওয়া যাবে।' আমরা চুপ করে আছি, তিনি বললেন, 'তোমরা যাই বল, আমি কিছুই করতে পারব না। এটা উপরের নির্দেশ। আগামী কাল থেকেই তা কার্যকর করতে হবে।' শিক্ষকরাও কিছু বলছেন না। আমরাও ভয়ে চুপ করে আছি, শেষে কিছুটা সাহস সঞ্চয় করে বললাম, 'স্যার, এখানে এসে যদি বোরকা খুলতে হয়, তাহলে আগামীকাল থেকে আমি আর স্কুলে আসব না।' ব্যাগ নিয়ে বাসায় চলে এলাম। পরদিন থেকে স্কুলে যাই না। আববু সফরে ছিলেন। সফর থেকে ফিরে সব শুনে বললেন, 'শাবাশ'! কিন্তু যে বিষয়টি আমার মনে কাঁটার মত বিঁধত তা হচ্ছে আমার সহপাঠীদেরকে আরও অনেকদিন ঐ স্কুলে কাটাতে হয়েছে এবং 'উপরের নির্দেশ' মানতে হয়েছে। আমার বোরকার বন্ধুদের জন্য আমি কিছুই করতে পারিনি। পরে আরও কয়েকজন স্কুল ছাড়ার হুমকি দিলে কর্তৃপক্ষ নির্দেশ শিথিল করেছিলেন এবং সাদা স্কার্ফে মুখ ঢাকার অনুমতি দিয়েছিলেন। তবে কমিটির সেই 'উপরওয়ালা' এলে তাদেরও নেকাব খুলতে হত। লজ্জায় তারা জানালার দিকে মুখ ফিরিয়ে রাখত।

আমার ছোট ভাই আমাকে সেই 'উপরওয়ালার' মৃত্যুর সংবাদ দিল। যারা সেদিন তার নির্দেশ অমান্য করার সাহস করেনি তারাই তাকে মাটির 'নীচে' রেখে এসেছে। 'উপর' আর 'নীচে'র মাঝে কত সামান্য ব্যবধান! তবুও আমরা কিছু মানুষ 'উপরওয়ালা' হয়ে যাই। আর কিছু মানুষ তাদের ভয়ে সিঁটিয়ে থাকি।

জানি না কী অবস্থায় তার মৃত্যু হয়েছে। তিনি কি ঈমানের সাথে বিদায় নিয়েছেন? নিশ্চয়ই তার সামনে এসেছেন মুনকার নকীর। তারাও কি তার আদেশ পালন করেছেন?

ঈমানের সাথে মৃত্যু হলে আল্লাহ যেন তাকে ক্ষমা করেন।

সন্তানকে মুমিন হিসেবে গড়ে তুলতে করণীয়

ইসলামে সন্তানদের সঠিক পথে পরিচালিত করা এবং তাদেরকে প্রকৃত মুমিন মুসলিম হিসেবে গড়ে তোলা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আল-কোরআন ও হাদিসে এই বিষয়ে সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা দেয়া হয়েছে। এখানে বিভিন্ন দিক থেকে আলোচনা করা হলো কীভাবে সন্তানদের ইসলামের প্রকৃত আদর্শে গড়ে তোলা যায়।

১. তাওহিদের বোধ জাগানো

আল-কোরআনের নির্দেশনা:

আল্লাহ তাআলা বলেন, "তোমার প্রভু স্থির করেছেন যে, তাঁকে ছাড়া অন্য কারো ইবাদাত করবে না এবং পিতামাতার সঙ্গে সদ্ব্যবহার করবে।" (সূরা আল-ইসরা: ২৩)

হাদিসের নির্দেশনা:

হযরত মুহাম্মদ (স.) বলেন, "তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে প্রথম শিক্ষা দাও, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ।'" (মুসনাদে আহমদ)

তাওহিদ তথা আল্লাহর একত্বের বোধ সন্তানের মধ্যে শৈশব থেকেই জাগ্রত করা উচিত। আল্লাহর প্রতি অগাধ বিশ্বাস এবং তাকওয়া (খোদাভীতি) সন্তানের চিন্তা-চেতনায় বদ্ধমূল করতে হবে।

২. নামাজের গুরুত্ব বোঝানো

আল-কোরআনের নির্দেশনা:

আল্লাহ তাআলা বলেন, "তোমার পরিবারকে নামাযের নির্দেশ দাও এবং তুমি নিজেও তা পালনে দৃঢ় থাক।" (সূরা তোহা: **১৩২**)

হাদিসের নির্দেশনা:

রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন, "সাত বছর বয়সে সন্তানদের নামাজের নির্দেশ দাও এবং দশ বছর বয়সে তা না পড়লে শাসন করো।" (আবু দাউদ)

সন্তানের মধ্যে নামাজের গুরুত্ব শৈশব থেকেই স্থাপন করতে হবে। নিয়মিত নামাজ আদায়ের অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে এবং তারা যেন নিয়মিত নামাজ আদায় করে তা নিশ্চিত করতে হবে।

৩. পবিত্র কুরআন শিক্ষা অধ্যয়নে উৎসাহ প্রদান

আল-কোরআনের নির্দেশনা:

আল্লাহ তাআলা বলেন, "এই কিতাব যা আমি তোমার প্রতি ওহী করেছি, তা খুবই বরকতময়, যাতে তারা তার আয়াতসমূহ অনুধাবন করে এবং বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা উপদেশ গ্রহণ করে।" (সূরা সাদ: ২৯)

হাদিসের নির্দেশনা:

রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন, "তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি সর্বোত্তম যে কুরআন শেখে এবং অন্যকে শেখায়।" (বুখারী)

সন্তানের মধ্যে কুরআন শিক্ষা ও অধ্যয়নকে উৎসাহিত করতে হবে। কুরআনের অর্থ ও মর্মবাণী বোঝানোর জন্য তাদেরকে তাফসীর ও অন্যান্য ইসলামিক বই পড়ার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে।

৪. নৈতিকতা ও আদর্শের শিক্ষা দেয়া

আল-কোরআনের নির্দেশনা:

আল্লাহ তাআলা বলেন, "তোমরা যে ভাল কাজই করবে, আল্লাহ তা জানেন।" (সূরা বাকারা: ১৯৭)

হাদিসের নির্দেশনা:

রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন, "মুমিনদের মধ্যে তাদের ঈমান সবচেয়ে উত্তম, যাদের চরিত্র ও আচরণ সবচেয়ে উত্তম।" (তিরমিজি)

সন্তানদেরকে নৈতিকতা, সততা, সদাচরণ, সহানুভূতি ও মানবিক গুণাবলির মাধ্যমে গড়ে তুলতে হবে। তাদের মধ্যে উত্তম চরিত্র ও আচার-ব্যবহার গড়ে তোলার জন্য অভিভাবকরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেন।

৫. ইসলামী জ্ঞানার্জন ও শিক্ষা গ্রহণে উদ্বুদ্ধকরণ

আল-কোরআনের নির্দেশনা:

আল্লাহ তাআলা বলেন, "তোমরা যারা বিশ্বাস করেছ, তোমরা নিজেদের ও তোমাদের পরিবার-পরিজনকে আগুন থেকে রক্ষা করো।" (সূরা তাহরীম: ৬)

হাদিসের নির্দেশনা:

রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন, "জ্ঞানার্জন প্রত্যেক মুসলিমের ওপর ফরজ।" (ইবনে মাজাহ)

সন্তানদেরকে ইসলামী জ্ঞান ও শিক্ষা প্রদান করা অত্যন্ত জরুরি। তাদের মধ্যে কুরআন, হাদিস, ফিকহ ও সিরাত সম্পর্কিত জ্ঞানার্জনের ইচ্ছা সৃষ্টি করতে হবে। ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি করা এবং অভিজ্ঞ আলেমদের সাথে পরিচিত করানো যেতে পারে।

৬. হালাল ও হারাম সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি

আল-কোরআনের নির্দেশনা:

আল্লাহ তাআলা বলেন, "হে মুমিনগণ, আমি তোমাদেরকে যে পবিত্র রুযী দিয়েছি তা ভক্ষণ কর এবং আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর, যদি তোমরা কেবল তাঁকেই উপাসনা করে থাক।" (সূরা বাকারা: ১৭২)

হাদিসের নির্দেশনা:

রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন, "নিশ্চয়ই আল্লাহ পবিত্র, তিনি পবিত্র জিনিসই গ্রহণ করেন।" (মুসলিম)

সন্তানদেরকে হালাল ও হারাম খাদ্য ও কর্মকাণ্ড সম্পর্কে সচেতন করা জরুরি। তাদেরকে হালাল পথে জীবনযাপন ও উপার্জনের গুরুত্ব বোঝাতে হবে।

৭. দোয়ার গুরুত্ব বুঝানো

আল-কোরআনের নির্দেশনা:

আল্লাহ তাআলা বলেন, "তোমরা আমাকে ডাকো, আমি তোমাদের ডাক কবুল করবো।" (সূরা গাফির: ৬০)

হাদিসের নির্দেশনা:

রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন, "দোয়া ইবাদতের মগজ।" (তিরমিজি)

সন্তানের মধ্যে দোয়া করার অভ্যাস গড়ে তোলা অত্যন্ত জরুরি। তাদেরকে নিয়মিত দোয়া করার গুরুত্ব বোঝাতে হবে এবং কোন কোন সময়ে ও পরিস্থিতিতে দোয়া করতে হবে তা শেখাতে হবে।

৮. পিতামাতার দায়িত্ব ও উদাহরণ

আল-কোরআনের নির্দেশনা:

আল্লাহ তাআলা বলেন, "তোমরা তোমাদের পরিবার-পরিজনকে আগুন থেকে রক্ষা করো।" (সূরা তাহরীম: ৬)

হাদিসের নির্দেশনা:

রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন, "তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং তোমরা প্রত্যেকেই তার অধীনস্থদের সম্পর্কে জবাবদিহি করবে।" (বুখারী ও মুসলিম)

পিতামাতার আচরণ ও কার্যকলাপ সন্তানের জন্য সবচেয়ে বড় উদাহরণ। পিতামাতাকে ইসলামী জীবনযাপনের প্রতিটি দিক মেনে চলতে হবে এবং সন্তানের সামনে উত্তম উদাহরণ সৃষ্টি করতে হবে।

সন্তানকে শাসন:

শাসনের নীতি

ইসলামের সকল শিক্ষা পূর্ণাঙ্গ ও ভারসাম্যপূর্ণ এবং সকল শ্রেণীর মানুষের জন্য পূর্ণ কল্যাণকর। তা'লীম-তরবিয়তের ক্ষেত্রেও ইসলামের ভারসাম্যপূর্ণ দিক-নির্দেশনা রয়েছে। তাতে যেমন নম্রতা ও সহনশীলতার নির্দেশনা আছে, তেমনি আছে শাস্তি ও শাসনের বিধান। তরবিয়তের ক্ষেত্রে শাস্তির কোনো প্রয়োজন নেই- এটা যেমন অবাস্তব কথা তেমনি শাস্তিকে তরবিয়তের প্রধান উপায় মনে করাও মূর্খতা। বস্তুত শাস্তি হচ্ছে ঔষধের মতো। স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য যেমন ঔষধের প্রয়োজন তেমনি তা'লীম-তরবিয়তের ক্ষেত্রে প্রয়োজন শাস্তি ও শাসনের। তবে একথা বলাই বাহুল্য যে, সুস্বাস্থ্যের মূল উপাদান ঔষধ নয়। সুস্বাস্থ্যের জন্য মূল উপাদান হল পুষ্টিকর খাবার, পরিমিত শরীরচর্চা, প্রয়োজনীয় বিশ্রাম ও শৃঙ্খলাপূর্ণ জীবনযাপন ইত্যাদি। এরপর অসুখ-বিসুখ হলে প্রয়োজন হয় চিকিৎসা ও ঔষধ ব্যবহারের। অতএব এর প্রয়োজনীয়তা বিশেষ অবস্থার সঙ্গে সীমাবদ্ধ। আর এ ক্ষেত্রেও রোগ-নির্ণয়, ঔষধ নির্বাচন, ব্যবহারের নিয়ম ও মাত্রা ইত্যাদির জন্য অভিজ্ঞ চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হয়। তরবিয়তের ক্ষেত্রে শাস্তির বিষয়টিও এখান থেকে অনুমান করে নেওয়া যায়।

মূলপন্থা নম্রতা ও সহনশীলতা

শিশুদের ক্ষেত্রে যতটা সম্ভব শাসন এড়িয়ে চলা উচিত। ধৈর্য্য ও সহনশীলতা সঙ্গে তাকে গড়ে তোলার চেষ্টা করতে হবে। যখন শাসনের প্রয়োজন হয় তখন পূর্ণ সংযম ও দূরদর্শিতার পরিচয় না দিলে শিশুর উপর এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয়। আল্লামা ইবনে খালদূন রাহ. ''আলমুকাদ্দিমা''য় লিখেছেন যে, 'শিশুর সঙ্গে যদি অতিরিক্ত দুর্ব্যবহার ও কঠিন আচরণ করা হয় তাহলে তারা ভীরু, অলস ও

পলায়নপর হয়ে যায়। তাদের উদ্যম ও প্রফুল্লতা বিনষ্ট হয়ে যায় এবং চ্যালেঞ্জ গ্রহণের যোগ্যতা হারিয়ে ফেলে।

'শাস্তি থেকে আত্মরক্ষার জন্য তারা মিথ্যাচার ও তোষামোদ রপ্ত করে ফেলে। একসময় এগুলোই তাদের স্বভাবে পরিণত হয় এবং আত্মমর্যাদা, সৎসাহস ও উন্নত চিন্তা ইত্যাদি গুণাবলি থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়। এরপর শাস্তি ও চাপের পরিবেশ থেকে মুক্তি লাভ করলেও ওই সব গুণাবলি আর তার মধ্যে সৃষ্টি হয় না।'

ইমাম গাযালী রাহ. শিশুদের তরবিয়ত-সংক্রান্ত এক দীর্ঘ আলোচনায় বলেন, 'শিশু যখন কোনো ভালো কাজ করে তখন তাকে বাহবা দেওয়া উচিত এবং অন্যদের সামনে তাকে সম্মানিত ও পুরষ্কৃত করা উচিত। পক্ষান্তরে কখনো যদি বিপরীত কিছু দেখা যায় তাহলে তা না দেখার ভান করে এড়িয়ে যাওয়া উচিত। বিশেষত শিশু যখন নিজেই তা লুকিয়ে রাখতে সচেষ্ট। আর তাকে সর্বদা ধমক দেওয়া উচিত নয়। কেননা এতে সে ভৎর্সনা শুনতে অভ্যস্থ হয়ে উঠবে। পিতা তাকে মাঝে মাঝে ভৎর্সনা করবেন। আর মা তাকে পিতার ভয় দেখিয়ে মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখবেন।'-ইহইয়াউ উলূমিদ্দীন

শিশুর মনোদৈহিক বিকাশে তার চারপাশের পরিবেশ কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা ইবনে সীনা-র একটি বক্তব্য থেকে বোঝা যায়।

ইবনে সীনা বলেন, 'শিশুর স্বভাব-চরিত্রের প্রতি গভীর দৃষ্টি রাখা কর্তব্য। লক্ষ্য রাখতে হবে, তাকে যেন চরম ক্রোধ, প্রচন্ড ভীতি, কিংবা দুঃখ-বেদনা ও রাত্রি জাগরণের মুখোমুখি না হতে হয়। তার চাহিদা ও পছন্দের প্রতি লক্ষ করতে হবে যেন সেগুলো পূরণ করা যায় আর তার অপসন্দগুলোও লক্ষ করতে হবে যেন সেগুলো থেকে তাকে দূরে রাখা যায়। এর ইতিবাচক প্রভাব তার শরীর ও মন উভয় ক্ষেত্রেই পড়ে থাকে। কেননা, শিশুর মন যদি ভালো থাকে তাহলে তার স্বভাব ও আচরণও সুন্দর হবে। আর উত্তম স্বভাব ও আচরণ যেমন শারীরিক সুস্থতা নিশ্চিত করে তেমনি মানসিক সুস্থতাও।'

বলাবাহুল্য যে, উপরোক্ত মুসলিম মনীষীদের বক্তব্য সম্পূর্ণ বাস্তবসম্মত। কোনো চিন্তাশীল ব্যক্তিই এর সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করবেন না।

আমরা যদি একদম গোড়ায় যাই এবং জগতের সর্বোত্তম শিক্ষক হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আদর্শ লক্ষ করি তাহলে দেখব যে, শিশুদের

সঙ্গে তাঁর আচরণ কত কোমল ছিল। হাদীস শরীফ থেকে কয়েকটি দৃষ্টান্ত তুলে দিচ্ছি :

১. হযরত বুরায়দা রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুতবা দিচ্ছিলেন। ইতিমধ্যে হাসান ও হুসাইন মসজিদে প্রবেশ করল। তাদের পরনে ছিল লাল রংয়ের জামা। তারা দৌড়ে আসছিল এবং পড়ে যাচ্ছিল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন খুতবা শেষ না করেই মিম্বর থেকে নেমে এলেন এবং তাদেরকে কোলে তুলে নিলেন। এরপর বললেন, 'তোমাদের সম্পদ ও সন্তান তোমাদের জন্য পরীক্ষার বিষয়।' আমি শিশু দু'টিকে দেখলাম যে, তারা দৌড়ে আসছে এবং পড়ে যাচ্ছে। তখন আমার পক্ষে ধৈর্য্য ধারণ করা সম্ভব হল না।'-জামে তিরমিযী ২/২১৮

২. হযরত আনাস রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'আমি দীর্ঘ নামাযের ইচ্ছা নিয়ে নামায আরম্ভ করি, কিন্তু যখন কোনো শিশুর ক্রন্দনের আওয়াজ শুনি তখন নামায সংক্ষিপ্ত করে দেই। কেননা, আমি জানি, শিশুর ক্রন্দনে মার অবস্থা কেমন হয়!'-সহীহ বুখারী, হাদীস ৭০৯

প্রসঙ্গত, শিশুদের তা'লীম-তরবিয়তের দায়িত্বে নিয়োজিত সম্মানিত উস্তাদগণের জন্য এখানে চিন্তার উপকরণ রয়েছে। শিশুদের শাসনের সময় আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অনুসরণে চিন্তা করতে পারি যে, এ অবস্থাটা যদি তার মার সামনে হয় তাহলে তাঁর কেমন লাগবে?

৩. হযরত আনাস রা. কয়েকজন শিশুর নিকট দিয়ে যাওয়ার সময় তাদেরকে সালাম দিলেন। এরপর বললেন, 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এভাবে শিশুদের সালাম দিয়েছেন।'-সহীহ বুখারী, হাদীস : ৬২৪৭; সহীহ মুসলিম, হাদীস ২১৬৮

৪. ইমাম মুসলিম রাহ. বর্ণনা করেন, লোকেরা তাদের প্রথম ফল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে নিয়ে আসত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা হাতে নিয়ে দুআ করতেন-'ইয়া আল্লাহ, আমাদের ফলফলাদিতে বরকত দিন, আমাদের শহরে বরকত দিন, আমাদের ছা' তে বরকত দিন, আমাদের মুদে বরকত দিন।' এরপর কোনো শিশুকে ডেকে তা দিয়ে দিতেন।-সহীহ মুসলিম ১/৪৪২

শিশুদের সঙ্গে কোমল আচরণই ছিল নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আদর্শ।

পরবর্তী সময়ের মনীষীগণ যতই গবেষণা করেছেন ততই তার সুফল প্রকাশিত হয়েছে। শিশুর মনোদৈহিক বিকাশে কোমল ব্যবহারের বিকল্প নেই।

এজন্য শিশুর তরবিয়তের ক্ষেত্রে মূল পন্থা হল, কোমলতা ও সহনশীলতা। যে কোনো ভুল-ত্রুটি নজরে পড়লেই শাস্তির কথা ভাবা উচিত নয়। প্রথমে ক্ষমার কথা চিন্তা করা উচিত। ইমাম নববী রাহ. বলেন, 'তাকে (ছাত্রকে) আপন সন্তানের মতো মমতা করবে এবং তার অন্যায় আচরণ ক্ষমা করে দিবে। কখনো কোনো বে-আদবী প্রকাশ পেলে ক্ষমা করে দিবে। কেননা, মানুষমাত্রই ভুল করে থাকে।'

এরপর কোমলতার সঙ্গে সংশোধনের চেষ্টা করবে।

শিশুর মন-মানস এবং স্বভাব-প্রকৃতির দিকে লক্ষ রাখা

কখনো শাস্তির প্রয়োজন হলে ঔষধ নির্ণয়ের মতো শাস্তির ধরন ও পরিমাণ নির্ণয়ে অত্যন্ত বিচক্ষণ হতে হবে। আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে, শাস্তি প্রদানের উদ্দেশ্য ক্রোধ চরিতার্থ করা নয়; উদ্দেশ্য হল শিশুর সংশোধন। এজন্য শাস্তির বিষয়ে অত্যন্ত ধৈর্য্য ও সংযমের পরিচয় দেওয়া কর্তব্য।

সব শিশু প্রকৃতিগতভাবে এক ধরনের নয়। কেউ সামান্য তাম্বীহ দ্বারাই ঠিক হয়ে যায় আবার কাউকে শাস্তি দেওয়ার প্রয়োজন হয়। কেউ শাস্তির দ্বারা সংশোধিত হয়, কেউ আরো বিগড়ে যায়। এ বিষয়গুলো আগে থেকেই পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে স্থির করা উচিত এবং যার জন্য যে পরিমাণ তাম্বীহ প্রয়োজন তার জন্য তা-ই প্রয়োগ করা উচিত।

তাম্বীহ ও শাস্তির ক্ষেত্রে পর্যায়ক্রম অনুসরণ করা

অনেকে বেত ও শাস্তিকে সমার্থক মনে করে থাকেন। যেন বেত ছাড়া শাস্তির কোনো উপায় নেই। অথচ এটা হল সর্বশেষ ব্যবস্থা। পূর্বের ব্যবস্থাগুলো পরীক্ষা না করে চুড়ান্ত ব্যবস্থা প্রয়োগ করা কোনোভাবেই সমীচীন নয়।

ইবনে মাছকইয়াহ বলেন, 'শিশুর প্রথম ভুল ক্ষমা করে দেওয়া উচিত। পুনরায় ওই ভুল হলে পরোক্ষভাবে তাম্বীহ করবে। যেমন তার উপস্থিতিতে বলা হল, 'এই কাজ করা ঠিক নয়। কেউ যদি তা করে থাক তবে সাবধান হয়ে যাও। এরপর সরাসরি তাম্বীহ করা যায়। এরপরও যদি ওই ভুল হয় তাহলে হালকা প্রহার করা যায়। এই সবগুলো পর্যায় অতিক্রম করার পরও যদি দেখা যায় সে সংশোধিত

হয়নি তাহলে কিছুদিন তাকে আর কিছু বলবে না। এরপর আবার প্রথম থেকে আরম্ভ করবে।

এ প্রসঙ্গে তিনি ইমাম মাওয়ারদী রাহ.-এর একটি নির্দেশনা উল্লেখ করেছেন। তা এই যে, 'শিশুকে সংশোধন করা মুরববীর জন্য কঠিন হয়ে গেলে এবং অব্যাহত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও তার মধ্যে আনুগত্য সৃষ্টি না হলে করণীয় হচ্ছে কিছু সময় তাকে অবকাশ দেওয়া। এরপর নতুনভাবে প্রচেষ্টা আরম্ভ করা।'-আততারবিয়াতু ওয়াত তা'লীম ফিলফিকরিল ইসলামী

সন্তানের দ্বীন শিক্ষা নিশ্চিত করা :সফর ১৪৩০ || ফেব্রুয়ারী ২০০৯

সন্তানের শিক্ষা-দীক্ষা সংক্রান্ত ভুলভ্রান্তি

আজ যারা কচিকাচা আগামীতে তারাই হবে জাতির কর্ণধার। সন্তান মা-বাবার কাছে আল্লাহ তাআলার এক মহা আমানত। এই আমানতের যথাযথ হক আদায় করা মা-বাবা ও অভিভাবকের কর্তব্য। কিন্তু অনেক মা-বাবাই সন্তানের তালীম-তরবিয়তের ব্যাপারে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারেন না। এর মূলে রয়েছে : এক. দ্বীন সম্পর্কে অজ্ঞতা এবং সন্তান যে একটি মহা আমানত-এ বিষয়ে সচেতনতার অভাব। দুই. বিজাতীয় রীতি-নীতি ও ফ্যাশন প্রীতি। তিন. বৈষয়িক উপার্জনকেই জীবনের সাফল্য হিসেবে মনে করা। এ কারণে সন্তানকে একজন ঈমানদার ও সাচ্চা মুসলমান হিসেবে গড়ে তোলার তাগিদ তারা বোধ করেন না। এ সকল মৌলিক চিন্তাগত ভ্রান্তিই সন্তানের তালীম-তারবিয়াতের ব্যাপারে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়।

সন্তান আমানত

সন্তান মা-বাবার নিকট আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে আমানত। তাদেরকে দ্বীন শিক্ষা দেওয়া, শরীয়তের প্রয়োজনীয় বিষয়াদি শেখানো এবং একজন ঈমানদার মানুষ হিসাবে গড়ে তোলা মা-বাবা ও অভিভাবকের কর্তব্য। আজ বৈষয়িক শিক্ষায় শিক্ষিত করা এবং চাকরি ও উপার্জনক্ষম করে গড়ে তোলাকেই শুধু দায়িত্ব মনে করা হয়। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, সন্তানকে হালাল ও বৈধ পন্থায় আয়-রোজগার শেখানোও পিতামাতার কর্তব্য। কিন্তু এটিই একমাত্র দায়িত্ব নয়; বরং তাদেরকে ইসলামী সভ্যতা (তাহযীব) শেখানো, দ্বীন ও শরীয়তের মৌলিক বিষয়াদি শেখানো এবং একজন দ্বীনদার-নামাযী ও প্রকৃত মানুষ হিসেবে গড়ে তোলাও মা-

বাবার দায়িত্ব ও কর্তব্য। হাদীস শরীফে এসেছে- ‘জেনে রেখ, তোমরা প্রত্যেকে দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেককে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। পুরুষ তার পরিবারবর্গের ব্যাপারে দায়িত্বশীল। তাদের ব্যাপারে তাকে জবাবদিহি করতে হবে।’ -সহীহ বুখারী ১/২২২ হাদীস ৮৯৩

সুসন্তান যেমন মা-বাবার জন্য দুনিয়া ও আখিরাতের বড় সম্পদ এবং সদকা জারিয়া তেমনি সন্তান যদি দ্বীন ও শরীয়তের অনুগত না থাকে, দুর্নীতি ও গুনাহে লিপ্ত হয়ে যায় তাহলে সে উভয় জগতেই মা-বাবার জন্য বিপদ। দুনিয়াতে লাঞ্ছনা, বঞ্চনা ও পেরেশানির কারণ। আর কবরে থেকেও মা-বাবা তার গুনাহর ফল ভোগ করতে থাকবে। আখিরাতে এই আদরের দুলালই আল্লাহ তাআলার দরবারে মা-বাবার বিরুদ্ধে আপিল করবে যে, তারা আমাকে দ্বীন শেখায়নি। তাদের দায়িত্ব পালন করেনি। তাই এই আমানতের হক আদায়ের প্রতি খুবই যত্নবান হতে হবে।

বিজাতীয় রীতিনীতি ও ফ্যাশন প্রীতি

কুরআন-হাদীসের একটি মৌলিক শিক্ষা হল, আচার-ব্যবহার, সাজসজ্জা, কৃষ্টি-কালচার ইত্যাদিতে ইসলামী স্বাতন্ত্রবোধ থাকা। এসব ক্ষেত্রে বিজাতীয় অনুকরণকে কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে। এটা দ্বীনের গুরুত্বপূর্ণ বিধান। এ সম্পর্কে কুরআন-হাদীসে অসংখ্য হেদায়েত রয়েছে।

হাদীস শরীফের ‘কিতাবুল আদব’ অধ্যায়ে এবং অন্যান্য প্রসঙ্গে বিধর্মীদের অনুকরণ না করার এবং কৃষ্টি-কালচারে তাদের বিরোধীতা করার অনেক তাকীদ এসেছে। একটি হাদীসে এসেছে- ‘যে ব্যক্তি কোনো জাতি বা সম্পদায়ের সাদৃশ্য গ্রহণ করল সে তাদের অন্তর্ভু&ক্ত।’

সুতরাং শিক্ষা-দীক্ষা, ফ্যাশন ও রীতিনীতিতে বিজাতীয়দের অনুকরণ করা এবং সে অনুযায়ী সন্তানদের গড়ে তোলা বড় ধরনের ভুল। এতে ইসলাম ও ইসলামী তাহযীব-তামাদ্দুন থেকে সে ধীরে ধীরে এমনিভাবে বের হয়ে যায় যার উপলব্ধিও থাকে না।

কুরআন মজীদ না শেখানো

একজন মুসলিম তার সন্তানকে আল্লাহর কালাম শেখাবে না এটা কি কল্পনা করাও সম্ভব? কিন্তু এদেশের অধিকাংশ মুসলমানের অবস্থাই এই। ভেবে দেখুন, লাখ লাখ টাকা খরচ করে সন্তানের জন্য বড় বড় ডিগ্রী নেওয়া হচ্ছে কিন্তু কুরআন পড়ানোর দিকে মনোযোগ দেওয়া হচ্ছে না। আমার একটি অভিজ্ঞতা আপনাদের

শোনাই। রমযান মাসের কথা। মাঝবয়সী একজন ভদ্রলোক মসজিদে বসে কুরআন শরীফ খুলে বুক ভাসিয়ে কাঁদছিলেন। নিজেকে কিছুতেই সংবরণ করতে পারছিলাম না। কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, চাচা কী হয়েছে? এ কথা শুনে আরো জোরে কেঁদে উঠলেন। এরপর বললেন, বাবা! আমি তো এই পবিত্র কালাম পড়তে পারি না। আমার জীবন তো শেষ প্রায়। আমার কী হবে। আমার বাবা আমাকে ডাক্তার বানিয়েছেন, কিন্তু কখনও কুরআন পড়াননি।' বলুন তো এ লোকটির পিতা ঐ সময় কবরে থেকে কী পাচ্ছিলেন? ভেবে দেখুন, দুনিয়াতেই অভিযোগ শুরু হয়ে গেছে। এরপর যারা আখেরাতের ভয়াবহ আযাবের মুখোমুখি হবে। আল্লাহ আমাদের সবাইকে হেফাযত করুন। তাদের অভিযোগ আরো কত কঠিন হবে!! কার বিরুদ্ধে? যে বাবা সন্তান মোল্লা হয়ে যাবে ভেবে কুরআন শেখাননি তার বিরুদ্ধে। শুধু কি তাই? স্বয়ং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও আল্লাহ তাআলার দরবারে এদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করবেন। কুরআন মজীদে এসেছে- (তরজমা :) 'রাসূল বলবেন, হে আমার রব, আমার কওম এই কুরআনকে পরিত্যাগ করেছে!' (সূরা ফুরকান ৩০)

স্বয়ং কুরআনের অভিযোগ করার কথাও এসেছে। তাই আমাদের অত্যন্ত সচেতন হওয়া কর্তব্য। সন্তান আল্লাহর পক্ষ থেকে আমানত, এ ব্যাপারে ভেবে চিন্তে পদক্ষেপ নিতে হবে। তাদেরকে ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার বানান তাতে আপত্তি নেই। কিন্তু তাদেরকে ঈমানদার বানানোও আপনার কর্তব্য। সন্তান কুরআন পড়তে ও বুঝতে পারে এতটুকু যোগ্যতা তার মধ্যে গড়ে তুলতে হবে। তাই শুধু ডাক্তার নয়; বরং দ্বীনদার ডাক্তার ও দ্বীনদার ইঞ্জিনিয়ার বানান। আর যদি দ্বীনের খাদেম আলেম বানাতে পারেন তবে তো সোনায় সোহাগা।

দ্বিতীয় খলীফা হযরত ওমর রা.এর ছেলে আব্দুল্লাহ, যখন সূরা বাকারা সমাপ্ত করেছিলেন তখন বাবা খুশিতে উট যবাই করে সমাজের লোকদেরকে দাওয়াত করেছিলেন। আজ আমরাও মিষ্টিমুখ করি কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা হয় সন্তান খৃষ্টান মিশনারীদের নামি দামি স্কুলে চান্স পেয়েছে এজন্য। সন্তান স্কলারশিপ পেয়ে ইসলামের জঘন্যতম শত্রু ইহুদীদের ইউনিভার্সিটিতে সম্পূর্ণ বৈরী পরিবেশে পড়ার সুযোগ পেয়েছে এজন্য।

তাই কলিজার টুকরা সন্তানের কচি সিনা বিধর্মীদের হাতে সোপর্দ না করে আসুন সাহাবায়ে কেরামের মতো আমরাও সন্তানকে আল্লাহ পাকের কালাম শেখাই।

আসমান-জমিনের মধ্যে সবচেয়ে পবিত্র, নূরানী ও সবচেয়ে বরকতময় কালাম কুরআন মজীদ। তাহলে এ থেকে আমার সন্তানকে বঞ্চিত করব কেন? এই কচি মনে যদি আল্লাহর পবিত্র কালাম স্থান পেয়ে যায় তাহলে পরবর্তী জীবনে কখনও যদি সে প্রতিকূল পরিবেশের সম্মুখীন হলেও অন্তরের এই নূর তাকে সৎ পথে চলতে সাহায্য করবে। সে খড়কুটার মতো অন্যায়ের জোয়ারে ভেসে যাবে না ইনশাআল্লাহ।

দ্বীন না শেখানো

সন্তানকে কুরআন শেখায় না এমন মা-বাবার হার যদি শতকরা ৭০ হয়ে থাকে তবে দ্বীন শেখায় না এদের হার শতকরা ৯০-৯৫ ভাগ। নামায কীভাবে পড়বে তাও শেখায় না। হালাল-হারাম, পাক-নাপাক, অযু-গোসল তো দূরের কথা। অথচ সন্তানকে দ্বীনের প্রয়োজনীয় বিষয়াদি শেখানো পিতা-মাতার উপর ফরয। এটা না শেখানো সন্তানের উপর সবচেয়ে বড় জুলুম।

বাবা-মাকে এ ভুলের জন্য কিয়ামতের দিন চুলচেরা জবাব দিতে হবে। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর সতর্কবাণী : 'পুরুষ তার পরিবারবর্গের ব্যাপারে দায়িত্বশীল। তাকে তাদের ব্যাপারে জবাবদিহি করতে হবে।' (সহীহ বুখারী ১/২২২, হাদীস ৮৯৩)

সন্তানকে ইসলাম বিদ্বেষী করে গড়ে তোলা

আধুনিকতার লেহাজ করে অনেক মা-বাবাই তাদের সন্তানদেরকে ইসলামের আহকাম ও ইসলামী তাহযীব-তামাদ্দুনের ব্যাপারে সম্পূর্ণ বিদ্বেষী করে গড়ে তোলেন। টুপি-দাড়ি, আলিম-ওলামা, মাদরাসা-মসজিদ ইত্যাদি বিষয়ে একটা নেতিবাচক ধারণা। তাদের অন্তরে ঠাঁই পায় (নাউযুবিল্লাহ)। শৈশব থেকেই নাস্তিক প্রকৃতির শিক্ষক বাছাই করা হয়। উপরন্তু স্যাটেলাইট চ্যানেল, ইন্টারনেট এর অবাধ ব্যবহার তো আছেই। সাথে সাথে এ ধরনের লেখকদের বইপত্র পড়তে দেওয়া হয় এবং এই মানসিকতা সম্পন্ন লোকদের পরিবেশেই তাদের বিচরণকে বিচক্ষণতার সাথে সীমাবদ্ধ রাখা হয়। এভাবে শিশুর মন-মানসকে বিষাক্ত করে দেওয়া হয়। এটা মারাত্মক ভুল। এজন্য পিতামাতাকে আল্লাহর দরবারে কঠিন শাস্তির মুখোমুখি হতে হবে।

শিশুর প্রথম পাঠশালা

শিশুর প্রথম পাঠশালা হচ্ছে মায়ের কোল। এখানে সে জীবনের অনেক কিছু শেখে। পরবর্তীতে এটাই তার অভ্যাসে পরিণত হয়। শরীয়তে এই পাঠশালার অনেক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

কিন্তু অত্যন্ত দুঃখজনক বিষয় এই যে, শিশুর এই প্রথম শিক্ষা শুরু হয় টিভি দিয়ে। মা-বাবা তাদেরকে সাথে নিয়েই টিভি দেখে, ধীরে ধীরে এই ছোট বাচ্চাটি নাচ-গান থেকে শুরু করে সব ধরনের অশ্লীলতা শিখতে থাকে, বড় পুতুল নিয়ে খেলা করে, ঘুমায়। ফুলের মতো এই বাচ্চার জীবন কী দিয়ে শুরু হচ্ছে একটুও কি তা ভেবে দেখা হয়েছে। এ সবই ভুল। আমানতের খেয়ানত।

শরীয়তের আদেশ হল, ভূমিষ্ট হওয়ামাত্র শিশুর ডান কানে আযান ও বাম কানে ইকামত দিবে। যেন তার জীবন শুরু হয় আল্লাহর বড়ত্বের বাণী 'আল্লাহু আকবার' দিয়ে এর পর মা-বাবার দায়িত্ব হল সন্তানের ভালো অর্থবোধক নাম রাখা। বাচ্চা কথা বলা শিখলে তাকে সর্বপ্রথম আল্লাহর নাম শেখানোর চেষ্টা করা উচিত। যিনি এই সন্তান দান করলেন এরপর তাকে বাকশক্তি দিলেন তার নাম সর্ব প্রথম শেখানোই কৃতজ্ঞ বান্দার পরিচয়।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আববাস রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, 'সন্তানকে প্রথম কথা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' শেখাও এবং মৃত্যুর সময় তাদেরকে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর তালকীন কর।' (শুআবুল ঈমান ৬/৩৯৭-৩৯৮, হাদীস ৮৬৪৯)

বাচ্চা বয়সেই অল্প অল্প করে আল্লাহর পরিচয় শেখানো, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নাম শেখানো, গল্পে গল্পে তাঁর পরিচয় ও আখলাক তুলে ধরা পিতামাতার কর্তব্য। এককথায় তার জীবনের প্রথম পাঠশালা থেকে সে যেন দ্বীনের শিক্ষা অর্জন করে তা আমাদের কাম্য হওয়া উচিত। ছোট ছোট আদব-কায়দা, যেমন ডান হাতে তিন শ্বাসে বসে পানি পান করতে শেখাবে। জুতা পরিধান করতে আগে ডান পা এবং খোলার সময় আগে বাম পা খোলা। বাথরুমে ঢোকার সময় আগে বাম পা, বের হওয়ার সময় ডান পা ইত্যাদি শেখার উত্তম সময় এই শৈশবটাই। ঘুমের দুআ, ঘুম থেকে ওঠার দুআ, খাওয়ার দুআ ইত্যাদি সহজ বিষয়গুলো এবং ছোট ছোট ব্যবহারিক সুন্নতে অভ্যস্ত করে গড়ে তোলার সময় এখনই। আর এটার দায়িত্ব মা-বাবার।

সন্তানের জন্য বিধর্মীদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং বিধর্মী শিক্ষককে প্রাধান্য দেওয়া

ঢাকাসহ দেশের সর্বত্র খৃষ্টান মিশনারীদের বহু স্কুল রয়েছে। তবে এসব স্কুলের অধিকাংশ ছাত্রই মুসলমান। শিক্ষকদের মধ্যে বিধর্মী এবং মুসলমান উভয় ধরনের রয়েছে। কিন্তু স্বাভাবিকভাবে শিক্ষা কারিকুলাম, ড্রেস ইত্যাদি নিয়ন্ত্রিত হয় মিশনারী কর্তৃক।

এগুলোতে পড়ার দ্বারা ছাত্রের একদিকে যেমন ধর্মের প্রতি বিরূপ মনোভাব নিয়ে বেড়ে উঠে অন্যদিকে সম্পূর্ণরূপে পাশ্চাত্য সংস্কৃতিতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। তাদের ভবিষ্যৎটা ঐভাবেই গড়ে উঠে।

আজকাল এদের অনুকরণে মুসলমানদের তত্ত্বাবধানেও কিছু কিছু স্কুল পরিচালিত হয়। সেখানে বাহ্যিক অশ্লীলতা আরো এক কাঠি বেশি। সন্তানের জন্য এমন স্কুল নির্বাচন করা বড় ধরনের ভুল।

একজন সাধারণ মুসলমানের এটুকু সচেতনতা ও আত্মমর্যাদা বোধ থাকা চাই যে, নিজের সন্তানকে কোনো বিধর্মীর হাতে তুলে দিবে না। লক্ষ করে দেখুন তো কোনো ইহুদী বা খৃষ্টান কি তার সন্তানকে কোনো মুসলিমের হাতে তুলে দেয়? তারা এ বাস্তবতা উপলব্ধি করতে পারে যে, ছাত্রের উপর তার শিক্ষকের অনেক ধরনের প্রভাব পড়ে। বিশেষ করে পরিণত বয়সের আগে তো শিক্ষকের অনেক কিছুই ছাত্রের হৃদয়পটে অংকিত হয়ে যায়। তাই সন্তানের প্রাথমিক শিক্ষার জন্য দ্বীনী মাদরাসাই সবচেয়ে উপযোগী। কিন্তু কেউ যদি এতটুকু না পারেন তবে অন্তত ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন শিক্ষকমন্ডলী এবং ধর্মীয় ভাবধারার স্কুল নির্বাচন করা কর্তব্য। এক্ষেত্রে অভিভাবকের ভুল পদক্ষেপ সন্তানের জন্য বড় ধরনের সর্বনাশ ডেকে আনে। এ পর্যায়ে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর একটি হাদীস উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি ইরশাদ করেন, 'প্রত্যেক শিশু (ইসলামের) ফিতরতের উপর জন্মলাভ করে। কিন্তু পিতা-মাতা তাকে ইহুদী বানায়, খৃষ্টান বানায়, অগ্নিপূজক বানায়। (সহীহ বুখারী ১/১৮৫, হাদীস ১৩৮৫; সহীহ মুসলিম ২/৩৩৬, হাদীস ২৬৫৮)

উপার্জন কেন্দ্রিক শিক্ষা নির্বাচন

আজকাল শিক্ষাকে পেশা হিসেবে অবলম্বন করা হয়ে থাকে। যে শিক্ষায় বেশি টাকা আয় করা যাবে সেটাই চাই। তা হোক না কেন যতই অসার। আবার যে পড়া পড়ালে এমন চাকরি করা যায় যেখানে মূল বেতনের পাশাপাশি অবৈধ ইনকামের পথ খোলা রয়েছে,সেটাকে সাগ্রহে নির্বাচন করা হয়। অর্থাৎ অভিভাবকগণও

সন্তানকে শিক্ষিত বানানোর উদ্দেশ্য থাকে বেশি বেশি আয়। ফলে সন্তান ধীরে ধীরে সেবার মানসিকতা ছেড়ে কমার্শিয়াল মানসিকতার হয়ে গড়ে উঠে।

আমার এক আত্মীয় বড় ইঞ্জিনিয়ার। সে অসৎ আয় করে না। এতে তার বাবা-মা তেমন সন্তুষ্ট নন। কেননা তার গ্রামের অন্যান্য ইঞ্জিনিয়াররা কত বড় বড় বিল্ডিং করল কিন্তু সে কিছুই করতে পারছে না। এই হল অভিভাবকদের শিক্ষা। এসবই ভুল।

শিক্ষাকে মানুষ হওয়ার জন্য, দেশ ও দশের সেবার মানসিকতা নিয়ে শিখতে হবে। তবেই তা হবে শিক্ষা। এই দৃষ্টি ভঙ্গি অর্জন করা গেলে নিজের ও জাতির উপকার হয় এমন বিদ্যা শেখার সুযোগ হবে। সাথে সাথে মানুষ গড়ার আসল শিক্ষা কুরআন ও হাদীস শেখারও সুযোগ বের হয়ে আসবে।

উচ্চ শিক্ষার জন্য অমুসলিম দেশে গমন

অনেক মা-বাবাই সন্তানকে উচ্চ শিক্ষার জন্য অমুসলিম দেশে পাঠিয়ে থাকেন। প্রশ্ন এই যে, এই সন্তান কি সেখান থেকে শুধু উচ্চ ডিগ্রীই নিয়ে আসবে? নাকি সঙ্গে করে ধর্মদ্রোহিতা ও নাস্তিকতাও নিয়ে আসবে, তা কি কখনও ভেবে দেখেছেন তার অভিভাবকগণ? মসজিদে ওই সন্তানের জন্য হুজুরের কাছে দুআ চাওয়া হয় কিন্তু কখনও কি হুজুরের কাছে এ সম্পর্কিত মাসআলা জেনেছেন যে, ওই সব দেশে উচ্চ ডিগ্রী কিংবা উপার্জনের উদ্দেশ্যে যাওয়ার হুকুম কী? মাসআলা হল, বৈরী পরিবেশে গিয়ে যে ব্যক্তি ইসলামী আদর্শের উপর অবিচল থাকতে পারবে না তার জন্য সেখানে যাওয়ার কোনো অনুমতি নেই। সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ও হারাম। কেননা, এতে ইচ্ছা করেই নিজেকে গুনাহ ও কুফুরীর দিকে ঠেলে দেওয়া হয়।

সন্তানের স্বাধীনতার নামে তাকে মুক্ত ছেড়ে দেওয়া

আজ সুশীল সমাজ সন্তানের ব্যাপক স্বাধীনতার প্রবক্তা। এই নীতি ইউরোপ-আমেরিকা থেকে আমদানীকৃত। যখন সন্তানের আখলাক চরিত্র গড়ার সময় তখন তাকে স্বাধীন ছেড়ে দেওয়া হয়। সে ভালো-মন্দ পরিবেশে মিশে যখন যার সাথে ইচ্ছা ঘুরাফেরা করে। ইন্টারনেটে সব ধরনের প্রোগ্রাম দেখতে থাকে। ধীরে ধীরে সে নানা ধরনের মন্দ প্রবণতায় অভ্যস্ত হয়ে যায়। পরবর্তীতে এই সন্তানই মা-বাবার কষ্টের কারণ হয়ে দাড়াঁয়। সময়মতো শাসন না করার কারণে বড় হয়ে বাবা-মার অবাধ্য হয়ে যায়। তাই এই ধরনের স্বাধীনতা দুনিয়াতেও সন্তান এবং পরিবার কারো জন্য সুখের কারণ হয় না। এর ফলে সমাজে বিশৃংখলা ও অপরাধ

বৃদ্ধি পায় এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের এক বৃহৎ অংশ ধ্বংসের মুখে নিপতিত হয়ে যায়।

আজ সমাজে বিভিন্ন ধরনের স্কুল রয়েছে। রয়েছে মাদক নিরাময় স্কুলও। এ জাতীয় স্কুলের সবকটিতে প্রচুর ছাত্র ভর্তি হচ্ছে। এরা ঐ সকল সন্তান, যাদেরকে মা-বাবা সময়মতো নিয়ন্ত্রণ করেননি। সন্তানকে মন্দ ও অসৎকাজ থেকে বাধা দেননি। ফলে সে ধীরে ধীরে অপরাধের সাথে জড়িয়ে পড়েছে। সুতরাং সন্তানকে অবাধ স্বাধীনতা দেওয়া একটি অসুস্থ চিন্তা। ভুল পদক্ষেপ। শরীয়ত বলে, সন্তান মা-বাবার কাছে আল্লাহর আমানত। তার আখলাক-চরিত্র গড়ার দায়িত্ব মা-বাবারই। সময় মতো তাকে শাসন করা, মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখা, সৎ ও দ্বীনী পরিবেশে রাখা তাদের নৈতিক দায়িত্ব।

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, ... সন্তানের বয়স সাত বছর হলে তাদের নামাযের আদেশ দাও, দশ বছর বয়সে নামাযের জন্য শাসন কর এবং এ বয়সে তাদের বিছানা পৃথক করে দাও।' (মুসনাদে আহমদ ২/২১৮, হাদীস ৬৭৫৬; সুনানে আবু দাউদ ১/৭১, হাদীস ৪৯৪)

সন্তানকে একেবারে স্বাধীন ছেড়ে দেওয়া যাবে না; বরং বুঝের বয়স হওয়া থেকেই তাকে পরিমিত শাসনের মধ্যে রাখার ব্যাপারে এ হাদীস সুস্পষ্ট দলীল। এছাড়া সাহাবা, তাবেঈন থেকে বহু বর্ণনা রয়েছে যে, মা-বাবার দায়িত্ব এবং কর্তব্য হল, সন্তানকে দ্বীন শেখানো, মন্দ কাজ ও মন্দ পরিবেশ থেকে দূরে রাখা। শুধু কি তাই? সন্তানের পরিণত বয়সে তাদের বিয়ের ব্যবস্থা করাও তাদের দায়িত্ব। যেন তারা কোনো পাপাচারে লিপ্ত না হয়ে যায়। অভিভাবকদের শীথিলতার কারণে সন্তান যদি কোনো গুনাহে জড়িয়ে পড়ে তবে এর জন্য দায়ী হবেন অভিভাবকগণ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, 'যার সন্তান রয়েছে সে যেন তার সুন্দর নাম রাখে এবং তাকে উত্তম চরিত্র শেখায়। যখন সে বালেগ হবে তখন তার বিয়ে দেয়। বালেগ হওয়ার পরও যদি বিয়ে না দেয় আর সে কোনো গুনাহ করে ফেলে তবে তার এ গুনাহ তার পিতার উপর বর্তাবে।' (শুআবুল ঈমান, বায়হাকী ৬/৪০১, হাদীস ৮৬৬৬)

সুতরাং বর্তমান প্রেক্ষাপটে স্বাধীতার অজুহাতে সন্তানকে মুক্ত ছেড়ে দেওয়া তাকে ধ্বংস করারই নামান্তর। বিশেষ করে নিম্নোক্ত বিষয়ে উদারতা করা সন্তানের নিশ্চিত ধ্বংসের কারণ :

ক) অসৎ সংশ্রব অবলম্বনে বাধা প্রদান না করা। সহপাঠী হোক কিংবা প্রতিবেশী বা আত্মীয়ের মধ্যে দুঃশ্চরিত্র ছেলে-মেয়েদের সাথে মেলামেশা করার ক্ষেত্রে ছাড় দেওয়া। যখন যেভাবে ইচ্ছা তাদেরকে মিশতে দেওয়া। এতে তাদের খারাপ চরিত্র অতি দ্রুত সন্তানের মধ্যে চলে আসে এবং সেও এক সময় তাদের মতো বা তাদের চেয়ে আরো খারাপ হয়ে যাবে।

খ) ডিশ এন্টিনা, ইন্টারনেট এর অশ্লীল প্রোগ্রাম, সিনেমা, টেলিভিশন, অশ্লীল ছবি, নাচ-গান ইত্যাদি দেখতে বাধা না দেওয়া। এক্ষেত্রে ছাড় দেওয়াও ধ্বংসাত্মক। এতে সন্তান পড়ালেখার পরিবেশ থেকে দূরে সরে যায় এবং তার স্বভাব-চরিত্রে অশ্লীলতা প্রবেশ করতে থাকে। ধীরে ধীরে সে বাবা-মার অবাধ্য হয়ে পড়ে এবং অশ্লীল কাজে জড়িয়ে পড়ে।

গ) পর্দার বিষয়ে ছাড় দেওয়াও ধ্বংসাত্মক। ঘরে-বাইরে সর্বত্র শরয়ী পর্দা রক্ষা করা ফরয। কিন্তু তথাকথিত মডার্ন ফ্যামিলী শরীয়তের এ হুকুমের প্রতি শীথিলতা করে থাকে। নিজেরা যেমনি পর্দা করে না তেমনি সন্তানকেও পর্দায় থাকার আদেশ দেয় না। এর কারণে সমাজের বিভিন্ন স্তরে গুনাহ ব্যাপক হচ্ছে। সন্তানের চরিত্র ধ্বংস হওয়ার এটি একটি বড় কারণ। তাই এ ব্যাপারে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে।

ঘ) ছেলেদেরকে মাহরাম নয় এমন মেয়েদের সাথে মিশতে দেওয়া এবং মেয়েদেরকে ঘরের বাইরে একাকী যাওয়ার অনুমতি দেওয়া এবং তাদেরকে এ ব্যাপারে স্বাধীন ছেড়ে দেওয়াও ধ্বংসাত্মক।

আল্লাহ তাআলা সঠিক বুঝ দান করুন। আমীন।

সন্তানের বিয়ে:

মানবজাতির এ ক্রমবর্ধমান ধারার এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো সন্তানসন্ততি। সন্তানকে যথাযথ প্রতিপালন করা মা-বাবার অপরিহার্য কর্তব্য। প্রাপ্তবয়স্ক হলে সন্তানকে বিয়ে দেওয়ার বিষয়টিও মা-বাবার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, কোরআন ও হাদিসে এ বিষয়ে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

পবিত্র কোরআনে আল্লাহ বলেন, তোমরা তোমাদের মধ্যকার অবিবাহিত নারী-পুরুষ ও সৎকর্মশীল দাস-দাসীদের বিয়ে দাও। তারা অভাবি হলে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে অভাবমুক্ত করে দেবেন। আল্লাহ প্রাচুর্যময় ও মহাজ্ঞানী। (সুরা নুর : আয়াত ৩২)।

প্রাপ্তবয়স্ক ছেলে-মেয়েদের বিয়ের ক্ষেত্রে দেরি না করার নির্দেশ দিয়েছেন হজরত মুহাম্মদ (সা.)।

হজরত আলী (রা.) কে হজরত মুহাম্মদ (সা.) বলেন, হে আলী, তিনটি জিনিসের ক্ষেত্রে বিলম্ব করবে না। নামাজের যখন সময় আসবে তখন নামাজ আদায় করা থেকে দেরি করবে না। মৃত ব্যক্তির জানাজা যখন হবে তখন কাফন-দাফন সম্পন্ন করতে দেরি করবে না। কোনো অবিবাহিতা মেয়ের জন্য যখন কোনো উপযুক্ত পাত্র পাবে তখন তাকে পাত্রস্থ করা থেকে বিলম্ব করবে না। (তিরমিজি ১/২০৬)

হজরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, হজরত মুহাম্মদ (সা.) বলেন, যার কোনো সন্তান হলো সে যেন তার সুন্দর নাম রাখে এবং উত্তম শিষ্টাচার শিক্ষা দেয়। সন্তান প্রাপ্তবয়স্ক হলে তাকে বিয়ে দেবে। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর সন্তানকে যদি বিয়ে না দেয় এবং সে পাপে লিপ্ত হয়, তাহলে বাবা গুনাহগার হবে। (বাইহাকি ৮১৪৫)

গুনাহমুক্ত জীবন গঠনে সবদিক থেকে উপযুক্ত ছেলে যদি বিয়ে করতে চায় তবে মা-বাবা যথাযথ সহযোগিতা করা উত্তম। বরং এ ক্ষেত্রে মা-বাবার কর্তব্য হলো বিয়ের ক্ষেত্রে উপযুক্ত ছেলের আগ্রহ ও পছন্দকে অগ্রাধিকার দিয়ে বিয়ের ব্যাপারে তাকে সুপরামর্শ দেওয়া। বিয়েতে সার্বিকভাবে সাহায্য-সহযোগিতা করা।

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রাহমাতুল্লাহি আলাইহির মাজহাবের ফতোয়া অনুযায়ী ছেলে-মেয়ে উভয়ের বিয়ে দেওয়া সামর্থ্যবান বাবার জন্য ওয়াজিব বা আবশ্যক। আল্লাহ মুসলিম উম্মাহর সব বাবা-মা ও অভিভাবককে উপযুক্ত ছেলেদের ব্যাপারে

সার্বিক দেখাশোনা, খোঁজখবর নেওয়া ও বিয়েশাদির ব্যবস্থা করে গুনাহমুক্ত রাখার তাওফিক দান করুন। আমিন।

সন্তানের প্রতি লোকমান (আ) এর নসীহত:

১. আল্লাহর সঙ্গে শরিক (অংশীদারিত্ব) সাব্যস্ত না করা: পবিত্র কোরআনে এরশাদ হয়েছে, 'হে ছেলে, আল্লাহর সঙ্গে শরিক করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহর সঙ্গে শরিক করা মহা অন্যায়।' (সুরা লোকমান, আয়াত: ১৩)

২. পিতা-মাতার সঙ্গে সদাচার: 'আর আমি মানুষকে তার মাতা-পিতার সঙ্গে সদ্ব্যবহারের জোর নির্দেশ দিয়েছি। তার মাতা তাকে কষ্টের পর কষ্ট করে গর্ভে ধারণ করেছে। দুই বছরে তার দুধ ছাড়ানো হয়। নির্দেশ দিয়েছি যে আমার প্রতি ও তোমার মাতা-পিতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। অবশেষে আমারই কাছে ফিরে আসতে হবে।' (সুরা লোকমান, আয়াত: ১৪)

৩. অন্যায়-অপরাধ থেকে বিরত থাকা: 'হে বৎস, কোনো বস্তু যদি সরিষার দানা পরিমাণও হয় অতঃপর তা যদি থাকে প্রস্তরগর্ভে অথবা আকাশে অথবা ভূগর্ভে, তবে আল্লাহ তাও উপস্থিত করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ গোপন-ভেদ জানেন, সবকিছুর খবর রাখেন।' (সুরা লোকমান, আয়াত: ১৬)

৪. নামাজ আদায়: 'হে বৎস, নামাজ কায়েম করো।' (সুরা লোকমান, আয়াত: ১৭)

৫. সৎ কাজের আদেশ ও মন্দ কাজের নিষেধ: 'সৎ কাজে আদেশ দাও, মন্দ কাজে নিষেধ করো।'

৬. বিপদে ধৈর্যধারণ: 'বিপদাপদে সবর করো। নিশ্চয়ই এটা সাহসিকতার কাজ।'

৭. মানুষকে অবজ্ঞা না করা: 'অহংকারবশে তুমি মানুষকে অবজ্ঞা করো না।' (সুরা লোকমান, আয়াত: ১৮)

৮. অহংকার না করা: 'পৃথিবীতে গর্বভরে পদচারণ করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ কোনো দাম্ভিক অহংকারীকে পছন্দ করেন না।' (সুরা লোকমান, আয়াত: ১৮)

৯. বিনয়ী হওয়া: 'পদচারণে মধ্যবর্তীতা অবলম্বন করো।'

১০. মানুষের সঙ্গে নিচু কণ্ঠে আকর্ষণীয়ভাবে কথা বলা: 'কণ্ঠ নিচু করো। নিঃসন্দেহে গাধার স্বরই সর্বাপেক্ষা অপ্রীতিকর।'

রেফারেন্স

১)মাসিক আল কাওসার

২)পারফেক্ট প্যারেন্টিং

৩)নববি তরবিয়ত

৪)সন্তান প্রতি পালনে এ যুগের চ্যালেঞ্জ

৫)ইন্টারনেট

৬)আমানি বার্থ